বিজ্ঞানে বাঙালী

"মোরা সত্যের 'পরে মন
করিব সমর্পণ,
খুঁজিব সত্য, লভিব সত্য,
পূজিব সত্য ধন।"

'বীরত্বে বাঙালী', 'ব্যায়ামে বাঙালী', 'বাংলার মনীষী', 'বাংলার ঋষি',
'আচার্য জগদীশ—জীবনী ও আবিষ্কার' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম.এ.

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

ভূমিকা

বছর পাঁচেক আগে যখন 'ব্যায়ামে বাঙালী' ও 'বীরত্বে বাঙালী' প্রকাশ করি সেই সময়ে এই সঙ্কল্পই মনে ছিল যে, বাঙালী-প্রতিভার সমস্ত দিকের পরিচায়ক এক-একখানি পুঁথি লিখিয়া বাঙালী ছেলেমেয়েদের মানুষ হবার উপকরণ যোগাইব। আজ সেই সঙ্কল্প আর এক পা' অগ্রসর হইল—'বিজ্ঞানে বাঙালী' লইয়া দেশবাসীর নিকট উপস্থিত হইলাম। ইহা পড়িয়া বাংলার ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান-চর্চায় কিছুমাত্র অনুরক্ত হইলে আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে।

এই পুস্তক প্রণয়নে ও চিত্রাদি সংগ্রহে যে সকল গ্রন্থকার, পত্রিকা-সম্পাদক ও প্রকাশকের গ্রন্থ ও পত্রিকাদি হইতে সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এতদ্ব্যতীত অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের সাহায্যও পাইয়াছি। তাঁহাদের নিকটও কৃতজ্ঞ রহিলাম। নব্য বাংলার বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকের জীবনী এবার সময়াভাবে দেওয়া সম্ভবপর হইল না, বারান্তরে এই ত্রুটি সংশোধনের প্রয়াস পাইব। ইতি

জন্মাষ্টমী, ভাদ্র
১৩৩৮

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

দ্বিতীয় সংস্করণ

বিংশ শতাব্দীর প্রাক্-মহাসমরীয় যুগ হতেই বিজ্ঞান-মনোবৃত্তি মানুষকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। আজকের দিনে বিজ্ঞানের প্রভাব জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়েছে যেটা ছিল মধ্যযুগে ধর্মের একচেটে।

'বিজ্ঞানে বাঙালী'র দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার সময় আজ এই কথাটাই মনে হচ্ছে বার বার, বাংলায় বুঝি জগৎ-জোড়া এই বিজ্ঞান-মনোভাবের ঢেউ লেগেছে। নইলে বাঙালী আজ বিজ্ঞানবিদের সম্মাননা কেন দেবে? আমার প্রয়াসের এই সফলতা সত্যি আমার গর্বের, তাই আমার স্বদেশবাসীর হাতে 'বিজ্ঞানে বাঙালী'র দ্বিতীয় সংস্করণ নিয়ে উপস্থিত হতে সাহসী হয়েছি। অত্যন্ত অল্প সময়ে বইখানি ছাপা হল, বারান্তরে আরো বিজ্ঞানবিদের জীবনী দেবার ইচ্ছা রইল।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ — শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

ঢাকা

সূচীপত্র

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

মহাপ্রাণ মহেন্দ্রলাল

"আমি তখন একুশ-বাইশ বছরের ছেলে, সবে এল্-এ পরীক্ষা দিয়া উঠিয়াছি। সে সময়ে আমি ভবানীপুরের আমার আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে বাস করিতেছিলাম। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, আমার সহরে থাকিবার স্থান ছিল না। আমার পিতার সহিত বন্ধুতাসূত্রে চৌধুরী মহাশয় আমাকে আনিয়া, দয়া করিয়া নিজ ভবনে স্থান দিয়াছিলেন। কেবল স্থান দিয়াছিলেন তাহা নহে, ভ্রাতৃনির্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার সেই ভবনের স্থায়ী চিকিৎসক ছিলেন। এল্-এ পরীক্ষাকালে গুরুতর শ্রম করাতে আমার এক প্রকার পীড়া জন্মে। বাসার লোকেরা আমাকে বলপূর্বক ধরিয়া ডাক্তার সরকারের নিকট উপস্থিত করেন। বলেন, "আমাদের বাসায় এই একটা বামনের ছেলে আছে, এল্-এ পরীক্ষার সময় গুরুতর শ্রম ক'রে এর কি অসুখ হয়েছে দেখুন, আপনাকে দয়া করে এর চিকিৎসার ভার নিতে হবে।" ডাক্তার সরকার দয়া করিয়া আমার চিকিৎসার ভার লইলেন, বলিলেন, "তোমার পীড়ার আনুপূর্বিক বিবরণ লিখে আমার কাছে পাঠিও।" কিন্তু সেদিন আর এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে আমার মনটা খারাপ হইল। মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিশচন্দ্র চৌধুরী একজন সাধু পুরুষ ছিলেন। আমরা যুবকদল

তাঁহাকে গুরুতুল্য ভক্তিশ্রদ্ধা করিতাম। কিন্তু তাঁহার একটা স্বভাব এই ছিল যে তিনি সকল বিষয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। সেদিন ডাক্তার সরকার যখন ব্যবস্থা-পত্র লিখিতেছেন, তখন তিনি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই কি ঔষধ দিলেন ?" ডাক্তার সরকার বিরক্ত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মেডিকেল কলেজে পড়েছেন ?"

গিরিশবাবু—না

ডাক্তার সরকার—তবে এমন আহম্মুকি করেন কেন ? আমি কি ঔষধ দিচ্ছি তাতে আপনার দরকার কি ?

এই কথাগুলি এমন রুক্ষভাবে বলিলেন যে, আমাদের সকলের প্রাণে বড় আঘাত করিল। তারপর আমার রোগের আনুপূর্বিক বিবরণটি ইংরাজীতে লিখিয়া পাঠাইবার সময় তৎসঙ্গে বাংলাতে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম। তাহা তাঁহার গিরিশবাবুর প্রতি পূর্বোক্ত কর্কশ ব্যবহারের জন্য তিরস্কারপূর্ণ ছিল। পাঠাইবার সময় মনে হইল না যে, নিজে ত গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান, যাহার অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে যাইতেছি, তাহাকেই তিরস্কার, এ কিরূপ ব্যবহার। চিঠিখানি পাঠাইয়াই চিন্তা হইল, বুঝি বা চৌধুরী মহাশয়দিগের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। ভয়ে ভয়ে বাস করিতে লাগিলাম। তৎপরদিন বৈকালে ডাক্তার সরকারের আসিবার কথা ছিল না। তথাপি তিনি আসিলেন। আসিয়াই নীচের ঘরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিবনাথ ভট্টাচার্য তোমাদের বাড়ীতে কে ?" তাহারা হাসিয়া বলিলেন, "সেই যে মশাই পাগল ছেলেটা।" শুনিলাম ডাক্তার সরকার গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ঈশ্বর করুন এমনি পাগলা ছেলে দেশে বেশী হয়। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

আমি উপরে বসিয়া পড়িতেছিলাম, লোকে আসিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া গেল ; "ওরে আয়, ডাক্তার সরকার তোকে

ডাকচেন।” আমি কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া উপস্থিত। আমি ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র ডাক্তার সরকার টেবিলের অপর পার্শ্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হস্ত প্রসারিত করিয়া আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন, “তোমার ইংরেজী ষ্টেটমেণ্ট দেখে খুসী হয়েছি ; আর তোমার বাংলা পত্রের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ কর।” আমি ত অবাক্। তারপর তিনি আমাকে তাঁর বাড়ী পর্যন্ত আনিলেন। গিরিশবাবুর ওরূপ প্রশ্ন করা কেন উচিত হয় নাই এবং এ শ্রেণীর লোকের কিছু শিক্ষার প্রয়োজন, এই সকল আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন। তখন আমি কোথায় আর তিনি কোথায়! আমি কলেজের একটা গরীবের ছেলে, তিনি সহরের একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। আমার তিরস্কারটা এই ভাবে গ্রহণ করাতে কি সাধুতারই পরিচয় পাইলাম।

এরূপ মানুষকে কে শ্রদ্ধাভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে?”

উপরে যাঁহার কথা লিখা হইয়াছে তিনিই স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। আর শিবনাথ ভট্টাচার্য নামে যে ছেলেটি নিজের কথা এমন ভাবে লিখিয়াছেন, তিনি পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ ধর্মাচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রলাল শুধু মহাপ্রাণ ও সদাশয় বলিয়াই এদেশে খ্যাত নহেন। এদেশে বিজ্ঞান-চর্চার প্রথম প্রবর্তকরূপেই তিনি জাতির নিকট নিত্য-কালের রত্নাসন লাভ করিয়াছেন। বিজ্ঞান-চর্চার আদি গুরু মহেন্দ্র-লালের অক্ষয় কীর্তি ‘বিজ্ঞান এসোসিয়েশন’ আজও গর্বোন্নত মস্তকে বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে।

অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। কিন্তু সে সময়ে কোন কলেজে বিজ্ঞান পাঠনার ব্যবস্থা ছিল না। সামান্য যাহা কিছু হইত তাহা কলিকাতা মেডিকেল কলেজেই আবদ্ধ ছিল। বিজ্ঞান পাঠের অদম্য আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার অধ্যাপকগণ একথা শুনিয়া আপত্তি করিলেন, প্রিন্সিপাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। অবশেষে মহেন্দ্রলালের আগ্রহাতিশয্যে তিনি অনুমতি দিলেন। মহেন্দ্রলাল ১৮৫৫ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইলেন।

এই বছর বৈশাখ মাসে মহেন্দ্রলালের বিবাহ হয় এবং ইহার পাঁচ বছর পরে ১৮৬০ সালে তাঁহার একমাত্র পুত্র স্বর্গীয় ডাক্তার অমৃতলাল সরকার জন্মগ্রহণ করেন। মেডিকেল কলেজের বীক্ষণাগারেই মহেন্দ্রলালের প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠে। এখানেই যেন তাঁহার ভিতরের সমস্ত শক্তি সচেতন হইয়া উঠিল। মনে হইল, এতদিন পরে তিনি আপনার ইপ্সিত কার্যক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইয়াছেন। পরম উৎসাহে তিনি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং অতি অল্প সময়েই তিনি প্রত্যেক অধ্যাপকের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। সে সময়ে মেডিকেল কলেজে যতগুলি পুরস্কার, পদক ও বৃত্তি ছিল, তিনি সমস্তগুলিই পাইয়াছিলেন। এমন প্রতিভাশালী ছাত্র মেডিকেল কলেজে বড় একটা দেখা যায় নাই। এ সম্বন্ধে একদিনের ছোট একটি ঘটনা বলিতেছি।

মহেন্দ্রলাল সেদিন তাঁহার এক আত্মীয়ের চোখ দেখাইবার জন্য তাহাকে কলেজের ডিস্পেন্সারিতে লইয়া গিয়াছেন এবং কম্পাউণ্ডারের নিকট হইতে ঔষধ লইতেছেন। তখন তিনি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সেই সময়ে ডাঃ আর্চার চক্ষু রোগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সর্বদাই পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে তাঁহার পরীক্ষাগারে চক্ষু সম্বন্ধে জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। সেদিন একটি ছেলেও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। ইহা

দেখিয়া মহেন্দ্রলাল দূর হইতে চীৎকার করিয়া তাঁহার উত্তর দিলেন। ডাঃ আর্চার বলিয়া উঠিলেন, "Who is that fellow ?" মহেন্দ্রলালকে তাঁহার নিকট আনা হইল। তিনি তাহার উপর অনেক জটিল প্রশ্ন বর্ষণ করিলেন। মহেন্দ্রলাল সকল প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর দিলেন। ডাঃ আর্চার যখন শুনিলেন যে, মহেন্দ্রলাল দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি আর্চার সাহেবের পরীক্ষাগারে আসিয়া চক্ষুরোগ সম্বন্ধে ভালরূপ অধ্যয়ন করিবার অনুমতি পাইলেন। অতঃপর তাঁহার উর্ধ্বতন শ্রেণীর ছাত্রদের অনুরোধে এবং প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপকদের অনুমতি লইয়া মহেন্দ্রলাল চক্ষু সম্বন্ধে চমৎকার একটি বক্তৃতা দিলেন।

এইরূপে কৃতিত্বের সহিত ছয় বছর অধ্যয়নের পর ১৮৬০ সালে তিনি মেডিকেল কলেজের সর্বশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল্-এম্-এস্ উপাধি লাভ করিলেন।

ইহার পরে ১৮৬৩ সালে মহেন্দ্রলাল এম্-ডি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করিলেন। তাঁহার পূর্বে ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে উক্ত উপাধি পাইয়াছিলেন। কাজেই দ্বিতীয় এম্-ডি বলিয়া তাঁহার নাম সকলের মুখেই সহরময় রটিতে লাগিল।

জীবন-যুদ্ধ

যে বছর মহেন্দ্রলাল এম্‌-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, সেই বছরেই কলিকাতায় প্রসিদ্ধ ডাক্তার সূর্যকুমার চক্রবর্তীর উদ্যোগে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের একটি শাখা স্থাপিত হয়। কলিকাতার বড় বড় ইংরাজ ও বাঙালী চিকিৎসক মিলিয়া এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভায় মহেন্দ্রলাল একটি চমৎকার বক্তৃতা দেন। উহাতে তিনি তীব্র ভাষায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-প্রণালীর অত্যন্ত নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, এই প্রকার হাতুরে ডাক্তারগণ যাহাতে সমাজের ক্ষতি করিতে না পারে তজ্জন্য এলোপ্যাথ ডাক্তারদের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। এলোপ্যাথ ডাক্তারদের উদাসীনতা ও কর্তব্যে অবহেলার জন্যই ইহারা সমাজে স্থান পাইতেছে। তাঁহার বাগ্মিতা ও চিন্তাশীলতায় উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইলেন। সেই সভাতেই তিনি উক্ত সভার অন্যতম সম্পাদক মনোনীত হইলেন। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি উহার সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন।

এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে মহেন্দ্রলালের জীবনের গতিপথ একেবারে বদলাইয়া দিয়া গেল। তজ্জন্য তাঁহার উক্ত বক্তৃতাটি উল্লেখযোগ্য। এক দিন এক বন্ধু তাঁহাকে মর্গান সাহেবের 'ফিলজফি অব হোমিওপ্যাথি' নামক পুস্তকখানি সমালোচনার জন্য দিলেন। কথা থাকে যে, কিশোরীচাঁদ মিত্র-সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" নামক পত্রিকায় উক্ত সমালোচনা প্রকাশিত হইবে। মহেন্দ্রলাল এই পুস্তক পড়িতে পড়িতে এক নূতন জ্ঞান লাভ করিলেন। বস্তুতঃ ইহার পূর্বে তিনি কোন

হোমিওপ্যাথি বই না পড়িয়াই তীব্র মন্তব্য করিয়াছিলেন। যাহা হোক্, এই পুস্তক পড়িয়া হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে মহেন্দ্রলালের ধারণা বদলাইয়া গেল। তিনি লণ্ডন ও নিউইয়র্ক হইতে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে সমস্ত বই আনাইয়া তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু কার্যত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ফলাফল না দেখিলে উহার দোষগুণ ভাল করিয়া বুঝা যাইতে পারে না। ইহার সুযোগও উপস্থিত হইল। এই সময়ে কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ও প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্তের সঙ্গে তাঁহার হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে বিচার উপস্থিত হয়। প্রত্যক্ষ ফলাফল দেখিবার জন্য মহেন্দ্রলাল রাজাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসা দেখিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুদিন রোগীর চিকিৎসা প্রত্যক্ষ দেখিয়া মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথিতে অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন।

মহেন্দ্রলাল যেমন সদাশয় ছিলেন, সেইরূপ নির্ভীক ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা আঁকড়াইয়া ধরিতেন। হোমিওপ্যাথিতে অনুরক্ত হওয়ার ফলে তাঁহার জীবনের সম্মুখে যে কালো মেঘ ঘনায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, কেবল মাত্র সত্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন বলিয়াই একাকী উহার সমগ্র ঝড়-ঝাপ্টা মাথায় লইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। সত্যের জন্য এমন ত্যাগ ও নিষ্ঠা জগতে কমই দেখা যায়। বস্তুতঃ ইঁহারাই আদর্শ সত্যাগ্রহী।

মহেন্দ্রলালের জীবনের এই বিপ্লবকারী ঘটনাটির কথা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর অমর লেখনীতে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"অন্য লোক হইলে মনের বিশ্বাস মনে রাখিয়া আপনার অর্থোপার্জন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় দেখিতেন, কিন্তু মহেন্দ্রলাল সে ধাতুর লোক ছিলেন না। যাহা সত্য বলিয়া একবার প্রতীতি হইত তাহা তিনি হৃদয় মনের সহিত অবলম্বন করিতেন; তাহা প্রকাশ বা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; অথবা সত্যাবলম্বন

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, মহেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে কিরূপ প্রবল ও শক্তিশালী দল ছিল। কিন্তু তিনি ইহাতে বিন্দুমাত্রও দমিলেন না। তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই তিনি আবার সর্ব সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। ১৮৬৭ সালের তাঁহার সম্পাদিত 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' নামক পত্রিকা বাহির হইল। লোকে অবাক্ হইল। দেখিল, লোকটার ভিতর অদম্য তেজ। এই পত্রিকা প্রকাশ করিয়া মহেন্দ্র-লাল নবোদ্যমে প্রচার-কার্য চালাইতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে হোমিওপ্যাথির প্রতি লোকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু মহেন্দ্র-লাল এক বিষয়ে সর্বদা সজাগ ছিলেন। তিনি নিজেকে কখনও প্রচার করিতেন না। সকলে তাঁহাকে অতি-বড় বলিয়া জানিত ও মানিত। কিন্তু তাঁহার এই মহত্ত্ব যাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্যকে খাটো না করে, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় উত্তম পুরুষের প্রয়োগ কমই হইত। যে লক্ষ্যের পথে তিনি চলিয়াছেন, তাঁহাকেই সর্বসমক্ষে বড় করিয়া ধরিতেন। এই ঘোরতর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যেও তাই তিনি স্থিরভাবে বলিতে পারি-তেন—'I was sustained by my faith in the ultimate triumph of truth'—"সত্য যাহা তাহা চরমে জয়যুক্ত হইবেই, এই বিশ্বাসেই আমি সবল ছিলাম।" এই সময়ে তাঁহার মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব শিক্ষকগণ এবং অন্যান্য ডাক্তারগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যেরূপ ঘোঁট পাকাইয়াছিলেন এবং তীব্র কটূক্তি বর্ষণ করিতেছিলেন, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া যে উদারতা ও মহানুভব-তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা মহেন্দ্রলালের যোগ্য বটে। তিনি বড় দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"Whatever may now have become the differ-ences between my venerable Preceptors of the Medical College and myself, I shall always look back

with ecstasy and gratitude on those days when I used to be charmed by their eloquences, pregnant with the words of Science."

এমন গুরুভক্তি এ যুগে বিরল। আবার লিখিয়াছেন—

"Persecution has already commenced. Professional combination is strong against me, and is likely to be stronger ; everyone's arm seems to be raised against me ; but I cannot deprive myself of the satisfaction that mine has been, and shall be, raised against none. It is probable "my bread will be affected," but I shall never forget the words of Jesus, who certainly speaks as man never spake that as beings, instinct with Reason, and made in the Image of our Creator, "We must not live, by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God."

এই কথা কয়টিতে মহেন্দ্রলালের মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কত বড় উদার ও বিশাল প্রাণ তাঁহার ছিল, তাই তিনি এমন উদার ভাবে সমস্ত গ্লানি ও অপবাদ মাথা পাতিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

সায়েন্স এসোসিয়েশন

এই মহানুভবতা ও উদার মনুষ্যত্ব মহেন্দ্রলালের জীবনের একদিক্ মাত্র। এজন্য তিনি সকলের পূজ্য ও বরণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যে কার্যদ্বারা সমগ্র বাঙালী কেন সমগ্র ভারতবাসীর প্রাতঃ-স্মরণীয় তাহা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'সায়েন্স এসোসিয়েশন।' এদেশে বিজ্ঞান-চর্চার সর্বপ্রথম পথ-প্রদর্শক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল। 'সায়েন্স এসোসিয়েশন' তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথি প্রচারের অগ্রণী বলিয়া আমাদের নমস্য নহেন, তিনিই আমাদের দেশে বিজ্ঞান-চর্চার সর্বপ্রধান প্রবর্তক ও উদ্যোক্তা বলিয়া চিরকাল আমাদের পূজ্য। আজ যে আমরা বিজ্ঞান-চর্চায় এত অগ্রসর হইতেছি, তাহার মূলে রহিয়াছে মহেন্দ্রলালের সাধনা ও তপস্যা। এখন সেই কথাই বলিতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাল্যকাল হইতেই মহেন্দ্রলাল বিজ্ঞানের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। বিজ্ঞান-চর্চা তাঁহার জীবনকে নেশার মত আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। বিজ্ঞানই ছিল তাঁহার জীবনের তপ, জপ ও সাধনা। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বিজ্ঞান-অনুশীলন ব্যতীত এদেশের কোন প্রকার উন্নতি সম্ভবপর নহে। এই বদ্ধমূল ধারণা অন্তস্থলে পোষণ করিয়া তিনি জীবন-যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন, ইহাই জীবনে কথঞ্চিৎ সফল করিয়া তিনি জীবন-শেষে আঁখি মুদিয়া-ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"I am impressed more than ever with the necessity of science cultivation by my countrymen not simply for their improvement, but as I have been saying from the very beginning, for their very

regeneration ; or I would not have sacrificed a life in endeavouring to awaken them to that necessity."

বিজ্ঞান পাঠে ও পঠনে তিনি এতদূর আনন্দ অনুভব করিতেন যে, তিনি নিজের বাটীতেই রীতিমত একটি বিজ্ঞান-ক্লাশ করিতেন। গরীব ছাত্র ও বিজ্ঞানানুরাগী পাড়া-প্রতিবাসীরা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তাঁহার বাটীতে সমাগত হইতেন। ডাক্তার সরকার তন্ময় হইয়া বক্তৃতা দিতেন। ধীরে ধীরে তাঁহার মানস-চক্ষে বিজ্ঞান-চর্চার একটি প্রতিষ্ঠান গড়িবার সঙ্কল্প ভাসিয়া উঠে। ১৮৬৯ সালে তিনি তাঁহার পত্রিকায় এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। উহাতে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে একটা সাড়া আনিয়া দিল। ইহারই ফলে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সেই বছর হইতে বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান প্রবর্তিত হইল। বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের এই সঙ্কল্প পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মহেন্দ্রলাল প্রবলভাবে আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। এ-বিষয়ে জনমত গঠনের জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টিত হইলেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিখ্যাত বিজ্ঞান-অধ্যাপক লেফণ্ট সাহেব মহেন্দ্রলালের এই উদ্যোগে যোগদান করিলেন। মহেন্দ্রলাল বুঝিয়া-ছিলেন, আমাদের দেশের লোকের নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য পাইতে হইলে রাজকীয় চাপরাস পরিতে হইবে। তাই তৎকালীন লেফ্টেনাণ্ট গভর্নরের সভাপতিত্বে 'সায়েন্স এসোসিয়েশনের' উদ্বোধন হইল—১৮৭৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী। এই তারিখ ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। প্রায় ছয় বছর আলোড়ন-আন্দোলনের ফলে এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপিত হইল। 'Indian Association for the Cultivation of Science' এদেশে এক নবযুগের সূচনা করিল।

এই প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে সে বিষয়ে তিনি পূর্বাপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিলেন। সেই

সায়েন্স এসোসিয়েশন

এই মহানুভবতা ও উদার মনুষ্যত্ব মহেন্দ্রলালের জীবনের একদিক্ মাত্র। এজন্য তিনি সকলের পূজ্য ও বরণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যে কার্যদ্বারা সমগ্র বাঙালী কেন সমগ্র ভারতবাসীর প্রাতঃ-স্মরণীয় তাহা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'সায়েন্স এসোসিয়েশন।' এদেশে বিজ্ঞান-চর্চার সর্বপ্রথম পথ-প্রদর্শক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল। 'সায়েন্স এসোসিয়েশন' তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথি প্রচারের অগ্রণী বলিয়া আমাদের নমস্য নহেন, তিনিই আমাদের দেশে বিজ্ঞান-চর্চার সর্বপ্রধান প্রবর্তক ও উদ্যোক্তা বলিয়া চিরকাল আমাদের পূজ্য। আজ যে আমরা বিজ্ঞান-চর্চায় এত অগ্রসর হইতেছি, তাহার মূলে রহিয়াছে মহেন্দ্রলালের সাধনা ও তপস্যা। এখন সেই কথাই বলিতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাল্যকাল হইতেই মহেন্দ্রলাল বিজ্ঞানের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। বিজ্ঞান-চর্চা তাঁহার জীবনকে নেশার মত আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। বিজ্ঞানই ছিল তাঁহার জীবনের তপ, জপ ও সাধনা। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বিজ্ঞান-অনুশীলন ব্যতীত এদেশের কোন প্রকার উন্নতি সম্ভবপর নহে। এই বদ্ধমূল ধারণা অন্তস্থলে পোষণ করিয়া তিনি জীবন-যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন, ইহাই জীবনে কথঞ্চিৎ সফল করিয়া তিনি জীবন-শেষে আঁখি মুদিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"I am impressed more than ever with the necessity of science cultivation by my countrymen not simply for their improvement, but as I have been saying from the very beginning, for their very

regeneration ; or I would not have sacrificed a life in endeavouring to awaken them to that necessity."

বিজ্ঞান পাঠে ও পঠনে তিনি এতদূর আনন্দ অনুভব করিতেন যে, তিনি নিজের বাটীতেই রীতিমত একটি বিজ্ঞান-ক্লাশ করিতেন। গরীব ছাত্র ও বিজ্ঞানানুরাগী পাড়া-প্রতিবাসীরা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তাঁহার বাটীতে সমাগত হইতেন। ডাক্তার সরকার তন্ময় হইয়া বক্তৃতা দিতেন। ধীরে ধীরে তাঁহার মানস-চক্ষে বিজ্ঞান-চর্চার একটি প্রতিষ্ঠান গড়িবার সঙ্কল্প ভাসিয়া উঠে। ১৮৬৯ সালে তিনি তাঁহার পত্রিকায় এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। উহাতে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে একটা সাড়া আনিয়া দিল। ইহারই ফলে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সেই বছর হইতে বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান প্রবর্তিত হইল। বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের এই সঙ্কল্প পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মহেন্দ্রলাল প্রবলভাবে আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। এ-বিষয়ে জনমত গঠনের জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টিত হইলেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিখ্যাত বিজ্ঞান-অধ্যাপক লেফণ্ট সাহেব মহেন্দ্রলালের এই উদ্যোগে যোগদান করিলেন। মহেন্দ্রলাল বুঝিয়া-ছিলেন, আমাদের দেশের লোকের নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য পাইতে হইলে রাজকীয় চাপরাস পরিতে হইবে। তাই তৎকালীন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নরের সভাপতিত্বে 'সায়েন্স এসোসিয়েশনের' উদ্বোধন হইল—১৮৭৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী। এই তারিখ ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। প্রায় ছয় বছর আলোড়ন-আন্দোলনের ফলে এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপিত হইল। 'Indian Association for the Cultivation of Science' এদেশে এক নবযুগের সূচনা করিল।

এই প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে সে বিষয়ে তিনি পূর্বাপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিলেন। সেই

সায়েন্স এসোসিয়েশনের পুরাতন বাড়ী

I would emphatically say that the Indian youth have shown as much aptitude for, and love of science, as the youth of any country in the world."

মহেন্দ্রলাল যুবকদের উপর এত-বড় নির্ভর ও আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন—যুবকদলও তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত, দেবতার মত ভক্তি করিত। তাঁহার অধ্যাপনা ছেলেরা মুগ্ধ হইয়া শুনিত।

তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য একবার বড়লাট লর্ড লিটন গভর্ণমেণ্ট হাউসে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে তিনি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রদর্শন করেন এবং সুললিত ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

সায়েন্স এসোসিয়েশনের প্রথম চেষ্টা হইল একদল শিক্ষক তৈরী করা যাঁহারা বৈজ্ঞানিক বিষয় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন। সায়েন্স এসোসিয়েশনকে একটি বিজ্ঞান কলেজ করা হয় নাই। ইহার লক্ষ্য ছিল, কলেজের পাঠ শেষ করিয়া যাহাতে বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী আলোচনা করিবার সুযোগ ছেলেরা পায়, তাহার ব্যবস্থা করা। এই জন্য অনেক ছেলেকে এখান হইতে বিদেশে পাঠান হইয়াছে। এখনও বহু ছেলে ইহার খরচে বিজ্ঞানচর্চা করিবার জন্য বিদেশে গিয়া থাকেন।

মহেন্দ্রলালের আজীবন-সঞ্চিত প্রচুর অর্থে এই প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি স্থাপিত হইলেও, ইহার প্রথম অবস্থায় যে দুই সদাশয় ব্যক্তি অর্থ-সাহায্য দ্বারা ইহার উন্নতি ও সৌকর্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার স্বর্গীয় কালীকিষেণ ঠাকুর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দান করেন এবং ভিজিয়ানগ্রামের রাজা একটি বীক্ষণাগার নির্মাণের সমুদয় অর্থ প্রদান করেন। ইহাদের দানশীলতার কথা ডাঃ সরকার কৃতজ্ঞ-চিত্তে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে কলিকাতার একদল খ্যাতনামা লোক এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাঁহারা প্রচার করিলেন, ডাঃ সরকার যে বিজ্ঞান-চর্চার জন্য এইরূপ অর্থের অপব্যয় করিতেন, তাঁহার প্রয়োজনীয়তা এই দরিদ্র দেশে আরো পঞ্চাশ বছর পরে হইবে। আমাদের দেশের বিষম দারিদ্র্য দূর করিয়া জাতিকে বাঁচাইবার পথ বাহির করিতে হইবে এবং সেজন্য চাই ব্যবহারিক বিজ্ঞান—যাহার ফলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া অর্থোপার্জনে সহায়তা করিতে পারিবে। ডাঃ সরকার ভূয়ো বিষয়ের পেছনে টাকা ঢালিতেছেন। দেশের প্রায় সমস্ত পত্রিকা একবাক্যে ইহাদের সমর্থন করিল। দেখিতে দেখিতে সায়েন্স এসোসিয়েশনের প্রতিযোগী 'ইণ্ডিয়ান লীগ' প্রতিষ্ঠিত হইল। বাংলায় ছোট লাটের সভাপতিত্বে সভা-সমিতি হইল। একদিন লোকে সবিস্ময়ে শুনিতে পাইল, ইণ্ডিয়ান লীগের জন্য ৫ দিনে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। সকলে বলিল, এই তো চাই।

চারিদিকে যখন ডাঃ সরকারের আযৌবনের স্বপ্ন-মন্দির এই শিশু-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ শরসমূহ নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তখন এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। মহেন্দ্রলাল যে কী ধাতুর তৈরী, তাহার পরিচয় লোকে পূর্বেও একবার পাইয়াছিল। এবারও দেখিল, মহেন্দ্রলালের অস্তাচলগামী জীবনে যৌবনের দুর্দমনীয় তেজ কিছুমাত্র কমে নাই। মহেন্দ্রলাল এই তীব্র বিপক্ষদলের বিরুদ্ধে সুযুক্তিপূর্ণ ওজস্বী বাক্য নিক্ষেপ করিলেন। তিনি বলিলেন, দেশে বিজ্ঞানের আলোচনা মোটেই আরম্ভ হয় নাই। এ অবস্থায় আমাদের প্রধান কর্তব্য, দেশে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি গঠনে সাহায্য করা। তবেই আমরা দেখিতে পাইব, আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি জাগ্রত হইয়াছে এবং শিল্প-বাণিজ্যাদি নানা ক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ চলিতেছে। কিন্তু সায়েন্স এসোসিয়েশন্

হইতে কতকগুলি কারিগর তৈরী করাই আমাদের লক্ষ্য নয়। বিজ্ঞানের নব নব জ্ঞানবিভবে জাতীয় মনীষাকে সমুদ্ধ করিয়া তোলাই ইহার প্রধানতম উদ্দেশ্য।

ক্রমে বিরুদ্ধ দল বুঝিতে পারিলেন, মহেন্দ্রলালের অপ্রতিহত প্রভাব কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবার নয়। তাহারা উভয় প্রতিষ্ঠান একত্রীকরণের প্রস্তাব করিলেন। মহেন্দ্রলাল আপোষ-রফা পছন্দ করিতেন না। তিনি চিরদিনই একগুঁয়ে ছিলেন। তিনি বলিলেন, বাংলাদেশে এখনও এরূপ প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে। এই দুই প্রতিষ্ঠানই বেশ পাশাপাশি চলিতে পারে। বছর দশেক কোন রকমে জীবনের ক্ষীণ প্রদীপটি জ্বালাইয়া একদিন অকস্মাৎ ইণ্ডিয়ান লীগ একেবারে নিভিয়া গেল।

মহেন্দ্রলালের সায়েন্স এসোসিয়েশন আজও গৌরবোন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত স্যর চন্দ্রশেখর রামনের মত জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এই প্রতিষ্ঠান হইতেই তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পূর্ণ সুযোগ পাইয়াছিলেন। ডাঃ রামন ও সায়েন্স এসোসিয়েশন্ আজ উভয়েই উভয়ের জন্য গৌরবান্বিত।

ডাঃ মহেন্দ্রলালের সুযোগ্য পুত্র ডাঃ অমৃতলাল সরকার এল্-এম্-এস্ ১৯১৯ সাল পর্যন্ত সায়েন্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন। এই বছর তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় সম্পাদকীয় দায়িত্ব স্যর সি. ভি. রামন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সায়েন্স এসোসিয়েশনের সুযোগ ও সুবিধা না পাইলে ডাঃ রামনের জীবন বোধ হয় অন্য পথে পরিচালিত হইত। ১৯০৭ সালে যখন তিনি কলকাতায় গভর্ণমেণ্টের ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্টের চাকুরী লইয়া আসেন, তখন হইতেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার নিকট তাঁহার চিরকৃতজ্ঞতার কথা কলিকাতা কর্পোরেশনের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন—"It was the late Dr. Mahendralal Sarcar, who, by founding Indian

Association for the cultivation of Science, made it possible for the scientific aspiration of my early years to continue burning brightly"

মহেন্দ্রলাল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্তা নহেন, কোন মৌলিক গবেষণায় তাঁহার যশ অর্জ্জিত হয় নাই। কিন্তু এদেশে বিজ্ঞান-চর্চার আদি গুরু বলিয়া তিনি চিরকাল সকলের পূজ্য ও নমস্য রহিবেন। সায়েন্স এসোসিয়েশন্ তাঁহার আযৌবনের স্বপ্ন ও কল্পনার মূর্ত বিগ্রহ। বর্তমানে সায়েন্স এসোসিয়েশন বৌবাজারে অবস্থিত ইহার পুরাতন ভবন ছাড়িয়া যাদবপুরে বিরাট অট্টালিকায় কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জীবন সন্ধ্যায়

মহেন্দ্রলাল তাঁহার জীবন-কালের প্রায় সমস্ত বৃহৎ সদনুষ্ঠানের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্যরূপে এবং পরে চারি বৎসর আর্ট ফ্যাকাল্‌টির সভাপতিরূপে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাতার অন্যতম অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব বৎসর পর্যন্ত ঐ কার্য দক্ষতার সহিত করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৩ সালে তিনি গভর্নমেণ্ট হইতে সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ক্রমান্বয়ে চারি বৎসর ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে ১৮৯৩ সালে স্বেচ্ছায় উক্ত পদ ত্যাগ করেন। বহু বৎসর তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন এবং কলিকাতা মিউজিয়মের একজন ট্রাষ্টি ছিলেন। ১৮৯৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অনারারী ডি-এল্‌ উপাধি প্রদান করেন। ইহা ছাড়া দেশ-বিদেশের অনেক বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

এইরূপ অসংখ্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সহিত সকল যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া একদিন এই কর্মবীর ভারতের বিজ্ঞান-গুরু মহেন্দ্রলাল পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। সেই কথাই বলিতেছি।

সারা জীবনব্যাপী অবিশ্রান্ত কার্যভারে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। শেষ বয়সে স্বাস্থ্য তাঁহার মোটেও ভাল ছিল না। তদুপরি ম্যালেরিয়া জ্বরে তাঁহাকে একেবারে কাবু করিয়া দিল; ম্যালেরিয়া তাঁহার নিকটে একটা আতঙ্ক হইয়া

দাঁড়াইয়াছিল। তিনি সহজে ম্যালেরিয়া রোগী দেখিতে যাইতেন না। কিন্তু এমন স্থান ছিল না, নিঃস্ব ও দুর্বলের চোখের জল যেখানে তাঁহাকে টানিয়া না নিত। একবার হুগলীতে একটি গরীব ছেলেকে চিকিৎসা করিতে যান। বাইরে গেলে তাঁহার ভিজিট ছিল প্রত্যহ এক শত টাকা। তিনি নয়দিন ছেলেটিকে দেখিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু এক কপর্দকও নিয়া আসেন নাই—নিয়া আসিলেন ম্যালেরিয়া। জীবনের শেষ দিনগুলি ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এই রোগাক্রান্ত শরীর লইয়াও তিনি কোন দিন তাঁহার সাধের সায়েন্স এসোসিয়েশনের কাজ হইতে বিরত হন নাই। কোন প্রলোভন তাঁহাকে এই নির্দিষ্ট কার্য হইতে বিরত করিতে পারিত না। একদিন ৪টার সময় সায়েন্স এসোসিয়েশনে তাঁহার বক্তৃতা দিবার কথা। ৩টার সময় একটি 'কল্' আসিল—ভিজিট দুই শত টাকা। তিনি দেখিলেন, এই রোগী দেখিতে তাঁহার অন্যূন দুই ঘণ্টা সময় লাগিবে। ৪টার সময় ছেলেরা তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া থাকিবে। নির্লোভ মহেন্দ্রলাল উহা অস্বীকার করিলেন। সায়েন্স এসোসিয়েশনেব কাজে তাঁহার কোনরূপ ত্রুটি হইবার উপায় ছিল না।

নিজে রোগী হইয়া মহেন্দ্রলাল অন্যেব রোগযন্ত্রণা বুঝিতেন। একবার তিনি স্বাস্থ্যলাভেব জন্য বৈদ্যনাথ গিয়াছিলেন। সেখানে কুষ্ঠ রোগীদের দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি আশ্রয়-বাটিকা নির্মাণ করিয়া দেন। উহা তাঁহার পত্নী 'রাজকুমারী সরকারের' নামে উৎসর্গ করেন।

শেষ বয়সেও তিনি খুব পড়া-শুনা করিতেন। দেশ-বিদেশ হইতে প্রতি সপ্তাহে তাঁহার জন্য বই আসিত। তাঁহার লাইব্রেরীটি একটি অমূল্য সম্পদ্। উহাতে যে সকল বই আছে তাহার মূল্য লক্ষ টাকার অধিক হইবে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও তিনি নূতন নূতন

বই আনাইয়া পড়িতেন। শুধু বিজ্ঞান নয়—সকল বিষয়ের বই-ই তাঁহার পড়ার বস্তু ছিল। তাঁহার শেষ অর্ডারী বই যখন য়ুরোপ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তিনি এই সংসারের বাঁধন কাটাইয়া পরপারে চলিয়া গিয়াছেন।

১৯০৩ সালে তাঁহার সত্তর বছর পূর্ণ হইল। এই বছর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পিতার জন্ম-উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। ইহার পর মাত্র বছর খানেক তিনি বাঁচিয়া ছিলেন। ভগবদ্ভক্ত মহেন্দ্রলাল বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে আপন মনে গান রচিত করিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাইতেন, সেই রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিতেন। ১৯০৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে মহেন্দ্রলাল ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

শাস্ত্রীমহাশয়ের ভাষাতেই এই পুণ্যজীবনী আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেই সাধু পুরুষের অমর বাণী উচ্চারণ করিয়াই ইহা সমাপ্ত করিলাম।—

"বঙ্গদেশকে যত লোক লোক-চক্ষে উঁচু করিয়া তুলিয়াছেন এবং শিক্ষিত বাঙালীগণের মধ্যে মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। এরূপ বিমল সত্যানুরাগ অতি অল্প লোকের মনে দেখিতে পাওয়া যায়; এরূপ সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা অতি অল্প বাঙালীই দেখাইতে পারিয়াছে; এরূপ জ্ঞানানুরাগ এই বঙ্গদেশে দুর্লভ।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

প্রাচ্যের যাদুকর

ঘটনাটি হইয়াছিল পঁয়ষট্টি বছর পূর্বে। তখন ইংরেজী ১৮৯৫ সাল। কলিকাতার টাউন হলে বক্তৃতা। বাঙলার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্নর স্যার উইলিয়াম মেকেঞ্জি স্বয়ং সভাপতির আসনে। সৌম্যদর্শন এক তরুণ বৈজ্ঞানিক অতি সুললিত ভাষায় বক্তৃতা দিতেছেন। সম্মুখে তাঁহার যন্ত্রপাতি। উহার সাহায্যে এক নূতন বৈজ্ঞানিক রহস্যের কথা বক্তার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছিল। অমন বিস্ময়কর কথা তখনও পৃথিবীর কোন লোকে শোনে নাই। বক্তার ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ মৃদু বায়ুতে ঈষৎ দুলিতেছে। মুখে তাঁহার আত্মপ্রত্যয়ের অম্লান ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। লোকে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। হঠাৎ একটা পিস্তলের আওয়াজ হইল, একটা লোহার গোলা নিক্ষিপ্ত হইল এবং বারুদস্তূপ উড়িয়া গেল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবিত যন্ত্রটি হইতে বিদ্যুৎ-ঊর্মি উদ্গত হইয়াই এই কাণ্ড করিয়াছে। বিদ্যুৎ-ঊর্মি সভাপতি মহোদয়ের বিশাল দেহ এবং দুইটি রুদ্ধ কক্ষের দুর্ভেদ্য দেয়াল ভেদ করিয়া ৭৫ ফিট্ দূরের তৃতীয় কক্ষে এইরূপ বিষম তোলপাড় উপস্থিত করিয়াছে। এই অদ্ভুত ভৌতিক ব্যাপার দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। এইরূপে বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার তারহীন বার্তাবহের মূল রহস্য সর্বপ্রথম আমাদের এই বাংলাদেশের এক তরুণ বৈজ্ঞানিকের দ্বারা আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু হায়, আমাদের কণ্ঠে সে যশোমাল্য পড়িল না! দেশবাসী অর্থসাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়া এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের পাশে দাঁড়াইল না। নইলে আজ সেই

বাল্য জীবন

"জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে; দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে, ভয়ের অতীত হইতে হইবে, সহস্র প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। অবিরাম চেষ্টা ও বিরুদ্ধ শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং মনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াই আমরা দেশের ও জগতের কল্যাণ সাধন কবিতে পারিব। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বর আচার্য জগদীশচন্দ্র জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহাদের পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার রাড়ীখাল গ্রামে। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় সে সময়ে ফরিদপুরের ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের বাল্য-জীবন ফরিদপুর সহবেই অতিবাহিত হয়। ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের মত অমন উৎসাহী ও কর্মঠ লোক সেকালে কেন একালেও অত্যন্ত বিরল। জাতীয় উন্নতিমূলক কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি নানা ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক ছিলেন। যদিও তাঁহার জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা একটির পর একটি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, তবু এই ব্যর্থতাই জগদীশচন্দ্রের জীবনে এক মহাশিক্ষা প্রদান করিয়াছে। জীবনের প্রভাতে চোখের সামনে ব্যর্থতার এই নগ্নরূপ পরবর্তী কালে তাঁহাকে জীবনসংগ্রামে নির্ভীক করিয়া তুলিয়াছিল। আচার্য জগদীশ এই কথার উল্লেখ করিয়া উৎসাহ-বাণী প্রচার করিয়াছেন—

"ভয় করিতেছ যে, সমস্ত জীবন দিয়াও তোমার অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে না? তোমার কি কিছুমাত্র সাহস নাই? দ্যূত-ক্রীড়কও সাহসে ভর করিয়া জীবনের সমস্ত ধন পণ করিয়া পাশা

নিক্ষেপ করে। তোমার জীবন কি এক মহাক্রীড়ার জন্য ক্ষেপণ করিতে পার না? হয় জয় কিংবা পরাজয়।

"যদিই বা পরাজিত হইলে, যদিই বা তোমার চেষ্টা বিফল হইল, তাহা হইলেই বা কি? তবে এক বিফল জীবনের কথা শোন,—ইহা অর্ধ শতাব্দীর পূর্বের কথা। যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি অতদিন পূর্বেও দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি উদ্ধার না করিলে দেশের আর কোন উপায় নাই। দেশে যখন কাপড়ের কল প্রথম স্থাপিত হয় তাহার জন্য তিনি জীবনের প্রায় সমস্ত অর্জন দিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রথম পথ-প্রদর্শক হন তাঁহাদের যে গতি হয়, তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। বিবিধ নূতন উদ্যমে তিনি বহু ক্ষতিগ্রস্ত হন। কৃষকদের সুবিধার জন্য তাঁহারই প্রযত্নে সর্বপ্রথমে ফরিদপুরে লোন-অফিস হয়। এখানে তাঁহার সমস্ত স্বত্ব পরকে দিয়াছিলেন। এখন তাহাতে শত গুণ লাভ হইতেছে। তাঁহারই প্রযত্নে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য ফরিদপুরে মেলা স্থাপিত হয়। তিনিই আসামে স্বদেশী চা-বাগান স্থাপন করেন। তাহাতেও তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার অংশিদারগণ এখন বহু গুণ লাভ করিতেছেন। তিনিই প্রথমে নিজ ব্যয়ে টেক্‌নিকেল স্কুল স্থাপন করেন, তাহার পরিচালনে সর্বস্বান্ত হন। জীবনের শেষ ভাগে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সমস্ত জীবনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যর্থ? হয়ত একথা তাঁহার নিজ জীবনে প্রযুজ্য হইতে পারে, কিন্তু সেই ব্যর্থতার ফলে বহু জীবন সফল হইয়াছে। তাঁহার জীবন দেখিয়া শিখিয়াছিলাম যে, সার্থকতাই ক্ষুদ্র এবং বিফলতাই বৃহৎ। এইরূপে যখন ফল ও নিষ্ফলতার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে শিখিলাম, তখন হইতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল। যদি আমার জীবনে কোন সফলতা হইয়া থাকে, তবে তাহা নিষ্ফলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা।"

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় অন্যান্য দশ জন ডেপুটীর মত সাধারণ জীবন যাপন করিতেন না। তাঁহার চিন্তা-প্রণালী ও কর্ম-প্রণালী অনন্যসাধারণ ছিল। পিতার এই অনন্যসাধারণতায় ছেলের বাল্যশিক্ষারও নূতনতর ব্যবস্থা হইল। জগদীশচন্দ্র এ বিষয়ে লিখিয়াছেন—"শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাঙ্লা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরেজী স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশীর পুত্র এবং বামদিকে এক ধীবর-পুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পক্ষী ও জলজন্তুর বৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবতঃ, প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এই সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।"

বাংলা স্কুলে পড়িবার সময় জগদীশচন্দ্রের একটি চমৎকার সাথী জুটিয়াছিল। এ লোকটা ডাকাতি করিত। ধরা পড়িয়া বসু মহাশয়ের নিকট শাস্তি পায়। জেল ভোগ করিবার পর সে বরাবর ডেপুটীবাবুর নিকট আসিয়া হাজির হইল এবং বলিল, হুজুর আমাকে তো আর কেউ কাজ দিবে না। আপনিই আমাকে রাখুন। নইলে দুনিয়ায় আমার আর দাঁড়াইবার ঠাঁই নাই। ভগবান্‌বাবু বলিলেন—বেশ, তুই আমার ছেলেকে দেখ্‌বি। রোজ তাকে স্কুলে নিয়ে যাবি, আবার ছুটির পর নিয়ে আস্‌বি।

লোকটা এরূপ আশ্রয় পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল। বালক জগদীশচন্দ্র প্রত্যহ ইহারই কোলে-কাঁখে চড়িয়া স্কুলে যাতায়াত করিতেন। এই লোকটা পরে কিরূপ বিশ্বাসী হইয়াছিল, তাহার একটি ঘটনা বলি। একবার ছুটির সময় ভগবানবাবু নৌকাযোগে সপরিবারে বাড়ী যাইতেছিলেন। নৌকা পদ্মা পাড়ি দিতেছে। এমন সময় দেখা গেল, একখানি ডাকাতের নৌকা তাঁহাদের দিকে তাড়া করিয়া আসিতেছে। অমনি ভগবানবাবুর এই ভৃত্যটি নৌকার

ছইএর উপর দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে কি এক সঙ্কেতধ্বনি করিল— তৎক্ষণাৎ ডাকাতের নৌকা কোথায় সরিয়া পড়িল। সমস্ত পরিবারটি রক্ষা পাইল।

বালক জগদীশচন্দ্র ইহার নিকট কত রোমাঞ্চকর ডাকাতির গল্প শুনিতেন। এই সকল লাঠালাঠি ও মারামারির কাহিনী শুনিতে শুনিতে জগদীশচন্দ্রের শিশু-মনে যোদ্ধৃ-বৃত্তি জাগ্রত করিয়া তুলিত। পরবর্তী কালে জগদীশচন্দ্রের জীবন-সংগ্রামে যে যোদ্ধৃবেশ দেখিতে পাই, তাহার উপকরণ বোধ হয় এই সময় হইতেই কিছু কিছু সঞ্চিত হইতেছিল।

ভগবান্‌বাবু ফরিদপুরে যে মেলা ও প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষে অনেক যাত্রার দল আনা হইত। সে কয়দিন বালক জগদীশচন্দ্রের আমোদের সীমা ছিল না। সারা রাত্রি জাগিয়া যাত্রা দেখিতেন। বাল্যকালের সে স্মৃতি এখনও যেন জ্বলজ্বল করিয়া চোখে ভাসিতেছে। এই সকল যাত্রায় রামায়ণ ও মহাভারতের বীরদের কাহিনী জগদীশচন্দ্রের তরুণ মনে গভীর দাগ অঙ্কিত করিয়াছিল। সব চেয়ে কর্ণের পৌরুষ জীবনটি তাঁহার অন্তরের মণিকোঠায় রত্নাসন লাভ করিয়াছিল। কর্ণ সম্বন্ধে পরবর্তী কালে লিখিয়াছিলেন— "ভীষ্মের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষগুণ মিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়। ঘটনাচক্রে যাহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহৎ ভাবের সংগ্রাম চিরপ্রজ্জ্বলিত ছিল, যে এক সময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।"

জগদীশচন্দ্রের মায়ের সম্বন্ধে দুই-একটি কথা এখানে বলিতেছি। তাঁহার মা অতিশয় উদারহৃদয়া, স্নেহশীলা ও নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন। মায়ের কথা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

"ছুটির পর যখন বয়স্যদের সঙ্গে আমি বাড়ী ফিরিতাম তখন

নিজের কিছু টাকাও আছে। আমি চালিয়ে নেব। তুই ঘুরে আয়।

এই সময়ে জগদীশচন্দ্রের পিতা কাটোয়া হইতে পাবনায় বদলী হইয়া আসিয়াছেন।

মায়ের অনুমতি পাইয়া জগদীশচন্দ্র ডাক্তারি পড়িবার জন্য বিলাত যাত্রা করিলেন। এই সময়ে তিনি বার বার কালাজ্বরে আক্রান্ত হইতেছিলেন। জাহাজেও একবার প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। একদিন তো অজ্ঞান হইয়া প্রায় যাইতে বসিয়াছিলেন। ষ্টীমারের যাত্রীরা বলাবলি করিতেছিল—বেচারার আর ইংলণ্ড দেখা হল না। যাহা হোক্, কিছুদিন মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিলেন এবং লণ্ডনে পৌঁছিয়া ডাক্তারি পড়া আরম্ভ করিলেন। কিন্তু জ্বর তাঁহাকে ছাড়িল না। বিশেষতঃ শব-ব্যবচ্ছেদের পূতিগন্ধে তাহাকে বিষম কাবু করিয়া দিত—উহার ফলে প্রবলবেগে জ্বর আসিত। যখন এইরূপ অবস্থা, তখন তিনি লণ্ডনের ডাক্তারি পড়া ছাড়িয়া দিলেন এবং কেম্ব্রিজে যাইয়া বিজ্ঞান-বিভাগে ভর্তি হইলেন। ১৮৮১ সালের জানুয়ারী মাসে কেম্ব্রিজে ভর্তি হইলেন। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে যখন তিনি পড়িতেছিলেন, সেই সময়েই তিনি বিশেষভাবে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যার প্রতি দৃষ্টি দেন। এই সময়কার অধ্যাপকদিগের মধ্যে মাইকেল ফষ্টর ভাইন্‌স্, ফ্রান্সিস ডারউইন ও লর্ড রালে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের প্রভাব জগদীশচন্দ্রের তরুণ মনে অনেকখানি বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পরবর্তী জীবনেও ইঁহারা এই তরুণ বাঙালী ছাত্রের আবিষ্ক্রিয়া সহানুভূতির চোখেই দেখিয়াছেন। চারি বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর জগদীশচন্দ্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাকৃতিক

সাধনা ও সংগ্রাম

"মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন.
ঈর্ষা-কণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সে দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভারতের মাটিতে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই জগদীশচন্দ্রের প্রকৃত কর্মজীবন আরম্ভ হইল। তাঁহার কর্মজীবন সংগ্রাম ও সংঘর্ষের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত রক্তায়িত হইয়াছে, কিন্তু ম্লান হয় নাই।

ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত ফসেট্ সাহেবের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি স্বদেশী যুগের নেতা স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু মহাশয়েব ঘনিষ্ঠতা ছিল। ফসেট্ সাহেবের একখানি পরিচয়পত্র লইয়া জগদীশচন্দ্র ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড রিপনের সঙ্গে দেখা করিলেন। লর্ড রিপন বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টকে লিখিলেন, জগদীশচন্দ্রকে যেন চাকুরী দেওয়া হয়। শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারীরা কৃষ্ণকায়দের অযোগ্যতা সম্বন্ধে চিরদিনই পঞ্চমুখ। ভারতের লোকে উচ্চ বিজ্ঞান-চর্চাদ্বারা রাজ-সরকারে যে উচ্চতর পদ লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারে, তাঁহাদের এ ধারণা ও বিশ্বাস ছিল না। জগদীশচন্দ্রের নিয়োগ লইয়া এই জন্য বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বিলম্ব করিতে লাগিলেন। অবশেষে লর্ড রিপনের নিকট হইতে পুনরায় তাগিদ খাইয়া অগত্যা জগদীশচন্দ্রকে কলিকাতা [illegible]সিডেন্সী কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু এই পদে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী যে মাহিনা পাইতেন, জগদীশচন্দ্রকে উহার দুই-তৃতীয়াংশ বেতন প্রদত্ত হইল। অধিকন্তু, এই পদ অস্থায়ী বলিয়া উক্ত বেতনেরও আবার অর্ধেক কাটিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে স্বাধীনচেতা জগদীশচন্দ্রের আত্মসম্মানে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তিনি এই বৈষম্য দূর করিয়া ন্যায্য অধিকার দাবী করিয়া তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। অবশেষে যখন দেখিলেন, সে প্রতিবাদে কোন ফল হইল না, তখন তিনি এক নূতন "অসহযোগ" পন্থা অবলম্বন করিলেন। তাঁহার বেতন বাবদ যে চেক্ দেওয়া হইত, তিনি তাহা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, স্পর্শও করিতেন না। সুদীর্ঘ তিন বৎসর তিনি কপর্দকমাত্র না লইয়া কলেজে কাজ করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সহধর্মিণীর অসীম ত্যাগ ও ধৈর্যে সকল কষ্ট আর কষ্ট মনে হইত না। এই সকল কারণে গভর্নমেণ্টের সুনজর হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু ইহাতে ফল ভালই হইল। এই বাঙালী যুবকের তেজস্বিতায় ও কর্তব্যনিষ্ঠায় ব্যুরক্রেটিক শাসনযন্ত্রের পরাজয় ঘটিল। তিন বৎসর পরে জগদীশচন্দ্রকে উপযুক্ত বেতনে স্থায়ী করা হইল এবং উক্ত তিন বৎসরের সম্পূর্ণ টাকা একযোগে তাঁহাকে দেওয়া হইল।

এই সময়ে ভগবান্‌বাবুর সবগুলি কারবারই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কাঁধে তাঁহার গুরু ঋণভার চাপিয়া আছে। কাজেই জগদীশচন্দ্রের এই টাকাটা তাঁহার পিতৃঋণ পরিশোধে সাহায্য করিল। বাড়ীর সম্পত্তি ও মাতৃসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অনেক ঋণ শোধ হইল। বাকী যাহা ছিল তাহা পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যে জগদীশচন্দ্র নিজ বেতন হইতে পরিশোধ করিয়া পিতার জীবিতকালেই পিতৃঋণমুক্ত হইয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে জগদীশচন্দ্রকে সপ্তাহে ২৬ ঘণ্টা পড়াইতে হইত। এই সুদীর্ঘ অধ্যাপনার পর তিনি লেবরেটরীতে যাইয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনায় রত হইতেন। এইরূপ কঠোর তপস্যায়

তাঁহার দিন চলিতেছিল। গভর্নমেণ্ট তাঁহার বেতন ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সাহায্য করেন নাই যাহাতে তাঁহার স্বীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা স্বচ্ছল ভাবে চলিতে পারে। ইয়ুরোপ বা আমেরিকার কোন দেশে জগদীশচন্দ্রের মত বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিলে, সময় ও অর্থের অভাবের অভিযোগ শুনিতে হইত না। হায় রে দুর্ভাগা বাঙালী!

একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন জগদীশচন্দ্র বিলাতে। ডাঃ ওয়ালার য়ুরোপের নামকরা বৈজ্ঞানিক। তাঁহার পরীক্ষাগার দেখিয়া জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"Dr. Waller যিনি ভেকের চক্ষু লইয়া গবেষণা করিতেছেন, তাঁহার পরীক্ষাগার দেখিতে গিয়াছিলাম। সে সব দেখিয়া ঈর্ষা-জর্জরিত হইয়াছি। তিনি স্বয়ং, দুই জন সহকর্মী (assistant—ইঁহাদের মধ্যে একজন Doctor of Science) এবং তাঁহার সহধর্মিণী, এই চারি জন প্রত্যূষ হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত কার্য করিতেছেন। সেই পরীক্ষাগারের এক কোণে আহার্য দ্রব্য পড়িয়া রহিয়াছে, যেন আহারের সময় কার্যের বিরাম না হয়। আর সেই লেবরেটরীর বর্ণনা তোমাকে কি করিয়া দিব। সমস্ত সপ্তাহে ৫ ঘণ্টা তাঁহাকে lecture দিতে হয়, তাহাই তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। এজন্য কাজ ছাড়িয়া দিবেন ভাবিতেছেন। Experimentএর ফল Photography দ্বারা স্বতঃ recorded হইতেছে। এইরূপ সম্পূর্ণতার সহিত কাজ চলিতেছে—আর আমার কাজ ভাবিয়া দেখ!"

১৮৯৪ সাল, ৩০শে নবেম্বর। জগদীশচন্দ্রের বয়স ৩৫ বৎসর পূর্ণ হইল। এই পুণ্য জন্মতিথিতে বাঙ্‌লার এই তরুণ বৈজ্ঞানিক পণ করিলেন, বিজ্ঞানের সাধনায় জীবন বলি দিবেন, জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিবেন। এই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের লেবরেটরী নিতান্ত সাধারণ রকম ছিল। গভর্নমেণ্টও ইহার উন্নতির জন্য

কোন চেষ্টা করিলেন না। কাজেই, জগদীশচন্দ্র নানা অসুবিধার মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু তিনি দমিবার লোক ছিলেন না। তিনি দেশীয় কারিগর দ্বারা নিজের তত্ত্বাবধানে অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্র প্রস্তুত করাইয়া কার্য চালাইতে লাগিলেন। যাঁহারা এদেশে গবেষণার উপযুক্ত লেবরেটরীর অভাবের অভিযোগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি জগদীশচন্দ্র পরবর্তী কালে বলিয়াছেন —

"সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণবিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অন্য দেশে যেখানে পরীক্ষাগার নির্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, সে স্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, কিন্তু পরের ঐশ্বর্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া লাভ কি? অবসাদ ঘুচাও। দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। মনে কর, আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে সেই বৃথা পরিতাপ করে।"

এই সঙ্কল্পের এক বছরের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র তাঁহার মৌলিক গবেষণার বিবরণী বিলাতের প্রসিদ্ধ রয়েল সোসাইটিতে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করিবার জন্য জগদীশচন্দ্রকে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়ার জন্য তাঁহাকে ডি-এস্-সি উপাধি প্রদান করিলেন। জগদীশচন্দ্রের প্রথম প্রচেষ্টা সকল হইল।

প্রথমে তিনি বৈদ্যুতিক গবেষণাতেই রত ছিলেন। ১৮৯৫ সালে তাঁহার সর্বপ্রথম প্রবন্ধ 'বিদ্যুৎ-উৎপাদক ইথর তরঙ্গের

কম্পনের দিক্ পরিবর্তন (Refraction of Electric Rays)' এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে পাঠ করেন। ইহার পর তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ 'ইলেকট্রিসিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রয়েল সোসাইটিতে যে প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন তাহার বিষয়-বস্তু ছিল—'পদার্থ-বিশেষের ভিতর দিয়া চলিবার সময় বৈদ্যুতিক রশ্মির পথ পরিবর্তন নির্ধারণ' (Determination of the indices of Refraction of various substances for Electric Rays)।

জগদীশচন্দ্রের জগৎ-খ্যাতি দেখিয়া ভারত-গভর্নমেণ্টও চুপ করিয়া থাকা ভাল মনে করিলেন না, উহা ভালও দেখায় না। কাজেই, আড়াই হাজার টাকা বছরে গবেষণার ব্যয়বাবদ বরাদ্দ হইল। বিলাতের রয়েল সোসাইটী সাহায্য না করিলে ভারত-সরকার জগদীশচন্দ্রকে এ সাহায্য করিতেন কিনা, সে বিষয়ে অনেকেই সন্দিগ্ধ।

এই সময়ে জগদীশচন্দ্র বিনাতারে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের উদ্ভাবনে রত হইয়াছিলেন। তাঁহার সাফল্যের কথা এই পুঁথির প্রথমেই বলিয়াছি। এই সময়ে পৃথিবীর তিন কোণে তিনটি লোক এই বিষয় লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছিলেন—আমেরিকায় লজ্, ইটালীতে মার্কনী ও ভারতবর্ষে জগদীশচন্দ্র। জগদীশচন্দ্রই ইঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়ার দ্বার উদ্ঘাটন করেন। তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে নিজ বাসা ও এক মাইল দূরবর্তী কলেজের সঙ্গে বিনাতারে সঙ্কেত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছিলেন। এমন সময়ে পশ্চিমের আহ্বান আসিল ; কাজেই আরব্ধ কার্য অসমাপ্তই রহিয়া গেল। এ বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের নিজের কথা একটু বলিতেছি। তিনি বিলাত হইতে লিখিয়াছিলেন—

"তোমাকে হয়ত পূর্বে লিখিয়াছি যে, বিখ্যাত ইলেক্ট্রিকাল কোম্পানী Messrs Muirhead & Co. আমার suggestions

অবলম্বন করিয়া Wirelss telegraphy সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য ফল লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, এতদিন পর্যন্ত তাঁহারা না বুঝিয়া অন্ধকারে ঘুরিতেছিলেন ; অনেক বিষয়ে বৃথা চেষ্টা করিয়া হতাশ্বাস হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার থিওরি অনুসারে এখন ঠিক পথে যাইয়া অনেক উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছেন। আমি আর একটি নূতন paper লিখিয়াছি, তাহাতে practical wireless telegraphyর অনেক প্রকার সুবিধা হইবে মনে হয়। Dr. Muirhead আমাকে নূতন আবিষ্কারগুলি গোপন রাখিতে অনুরোধ করিতেছেন ; কিন্তু আমার এখানে সময় অল্প, আমার আরও অনেক কাজ করিতে হইবে। একবার যদি অর্থকরী বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হই, তাহা হইলে আর কিছু করিতে পারিব না।

"একজন অতি বিখ্যাত টেলিগ্রাফ কোম্পানীর ক্রোড়পতি মালিক (proprietor) একদিন টেলিগ্রাফ করিয়া জানাইলেন, দেখা করিবার বিশেষ দরকার। আমি লিখিলাম, "সময় নাই।" তাঁর উত্তর পাইলাম, "আমি নিজেই আসিতেছি।" অল্পক্ষণ মধ্যেই স্বয়ং উপস্থিত, হাতে patent form। আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, আপনি যেন বক্তৃতায় সব কথা খুলিয়া বলিবেন না। There is money in it. Let me take out a patent for you. You do not know what money you are throwing away." ইত্যাদি। অবশ্য, "I will only take half share in the profit—I will finance it." ইত্যাদি। এই ক্রোড়পতি আরো কিছু লাভ করিবার জন্য আমার নিকট ভিক্ষুকের ন্যায় আসিয়াছে। বন্ধু, তুমি যদি এদেশের টাকার উপর মায়া দেখিতে—টাকা—টাকা—কি ভয়ানক সর্বগ্রাসী লোভ। আমি যদি এই যাঁতাকলে একবার পড়ি, তাহা হইলে উদ্ধার নাই। দেখ, আমি যে কাজ লইয়া আছি, তাহা বাণিজ্যের লাভালাভের

উঁপরে মনে করি না। আমার জীবনের দিন কমিয়া আসিতেছে, আমার যাহা বলিবার তাহাও সময় পাই না, আমি অসম্মত হইলাম। কিন্তু সেদিন আমার বক্তৃতা শুনিতে অনেক টেলিগ্রাফ কোম্পানীর লোক আসিয়াছিল; তাহারা পারিলে আমার সম্মুখ হইতেই আমার কল লইয়া প্রস্থান করিত। আমার টেবিলে assistantএর জন্য হাতে লেখা নোট ছিল, তাহা অদৃশ্য হইল।"

আর একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

"এখানকার আর এক Wireless Telegraphyর লোকেরা আমার প্রথামত কল প্রস্তুত করিয়া আশাতীত ফল পাইয়া আমাকে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছে।"

"আমার ইষ্টাকাঙ্ক্ষী এদেশীয় বন্ধুগণ আমার নূতন কয়েকটি আবিষ্ক্রিয়া আমার স্বার্থের জন্য কিয়দ্দিন অপ্রকাশিত রাখিতে পরামর্শ দিতেছেন; আমাকে যেন কোন দুর্দিনে কেবল গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী না হইতে হয়। কিন্তু, আমি এইরূপ রুদ্ধজীবন লইয়া কাজ করিতে পারি না। Romeএ International Congress on Wireless Telegraphy হইতে অনুরোধ-পত্র আসিয়াছে, তাহাতে লিখিয়াছেন,—'আপনার কার্য হইতে অনেক উন্নতি আশা করি, আপনার উপদেশ ও নূতন আবিষ্ক্রিয়াতত্ত্ব জানাইয়া উন্নতি বর্ধন করিবেন।' আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত কর। আমি জীবনের বাকী কয়দিন যেন উন্মুক্ত প্রাণে কার্য করিতে পারি।"

জগদীশচন্দ্রের একজন আমেরিকান বন্ধু তাঁহার এই প্রকার অসংসারী ভাবে বিরক্ত হইয়া তাঁহারই আবিষ্ক্রিয়া নিজ নামে 'পেটেণ্ট' করিয়া লইলেন। জগদীশচন্দ্র উহার প্রতিবাদ করিলেন না, তাঁহার পেটেণ্ট লইবার অধিকার ও সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

'প্রবাসীর' প্রবীণ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই কথা উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন—

"বে-তার টেলিগ্রাফের সম্ভাবনার কথা সর্বপ্রথমে তাঁহারই মনে উদিত হইয়াছিল, অথচ সহানুভূতি ও অর্থাভাবে যে তাঁহার সেই গবেষণা পরিণতি প্রাপ্ত হইল না, এই কলঙ্ক চিরদিন বাঙ্‌লা দেশকে পীড়া দিবে।"

জগদীশচন্দ্রের মস্তিষ্ক যে আবিষ্ক্রিয়া সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করিল, তাহার কৃতিত্ব লইয়া অন্যে নামযশ পাইল। নির্লোভ জগদীশচন্দ্র সংযত সাধকের মত জ্ঞানের দুয়ার উদ্‌ঘাটন করিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কর্মক্ষেত্র নূতনতর জ্ঞানরাজ্যে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

সাধনা ও সংগ্রাম—বিদেশে

"বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীন হীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

যাহারা ভীরু তাহারাই বহু ব্যর্থ সাধনা ও মৃত্যুভয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। বীর পুরুষেরাই নির্ভীক চিত্তে মৃত্যু-ভয়ের অতীত হইতে সমর্থ হন।

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

এই সময়ে জগদীশচন্দ্র নিজের গবেষণাগুলি প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য য়ুরোপে যাওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করিলেন। এই নিমিত্ত ১৮৯৬ সালে জগদীশচন্দ্র এক বছরের ছুটির জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। ইহা তাঁহার প্রাপ্য ছিল। বাংলার (লেফ্‌টেনাণ্ট) গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য য়ুরোপে পাঠাইতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। গভর্নর স্পষ্ট জবাব দিলেন, এরূপ নিছক শিক্ষা-বিষয়ক ডেপুটেশন্ গভর্নমেণ্ট পাঠাইতে প্রস্তুত নয়। এমন কি ভারত-গভর্নমেণ্টের শিক্ষা-পরিষদে এমন প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে যে, ভারতীয়গণ কখনও বিজ্ঞান-চর্চায় মনোযোগী হয় নাই। জগদীশচন্দ্র ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন এবং উত্তর দিলেন যে, শিক্ষা-পরিষদের এরূপ উদাসীনতা কোন সভ্য গভর্নমেণ্টের পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়। এই স্পষ্ট উক্তিতে গভর্নর জগদীশচন্দ্রের উপর বেশ রুষ্টই হইলেন। কাজেই, আর কোন কথাবার্তা হইল

না। জগদীশচন্দ্র যখন ক্ষুণ্ণমনে দার্জিলিং ষ্টেশনে উপস্থিত — কলিকাতায় ফিরিবার জন্য, সেই সময়ে ডিরেক্টরের চাপরাশীর নিকট একখানা চিঠি পাইলেন। গভর্নর তাঁহাকে বিলাত পাঠাইবেন, স্বীকৃত হইয়াছেন।

জগদীশচন্দ্রের এই প্রথম বৈজ্ঞানিক অভিযানের কথা তাঁহার সহধর্মিণী অবলা বসু মহাশয়ার স্বলিখিত বিবরণটি হইতে এখানে তুলিয়া দিলাম।

"১৮০৬ সালে আচার্য বসু মহাশয় অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে তাঁহার নূতন আবিষ্ক্রিয়া বৈজ্ঞানিক-সমাজে প্রদর্শন করিবার জন্য ব্রিটিশ এসোসিয়েশন্ কর্তৃক আহূত হন। তাঁহার সঙ্গে আমিও যাই। এই আমার প্রথম ইয়োরোপ যাত্রা।

"বিলাতে পৌঁছিয়াই আচার্য লিভারপুলে সমবেত ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হন। বক্তৃতার দিন হলটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দ্বারা পূর্ণ দেখিলাম। তাঁহাদের মধ্যে Sir J. J. Thomson (স্যর জে. জে. টমসন), Oliver Lodge (অলিভার লজ) ও Lord Kelvin (লর্ড কেল্‌ভিন) ছিলেন। আমি বাঙালীর মেয়ে সভয়ে উপরের গ্যালারিতে অন্যান্য দর্শকবৃন্দের মধ্যে বসিলাম। এতকাল ত ভারতবাসী বিজ্ঞানে অক্ষম এই অপবাদ বহুকণ্ঠে বিঘোষিত হইয়াছে। আজ বাঙালী এই প্রথম বিজ্ঞান-সমরে বিশ্বের সম্মুখে যুঝিতে দণ্ডায়মান। ফল কি হইবে ভাবিয়া আশঙ্কায় আমার হৃদয় কাঁপিতেছিল, হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল। তারপর যে কি হইল, সে-সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোন ছবি আজ আর নাই। তবে ঘন ঘন করতালি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, পরাভব স্বীকার করিতে হয় নাই, বরং জয়ই হইয়াছে। দেখিলাম, একজন বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া গ্যালারিতে উঠিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া আচার্যের সম্বন্ধে বহুবিধ প্রশংসা করিলেন। জানিতে পারিলাম, ইনিই বৈজ্ঞানিক

লর্ড কেলভিন। অলিভার লজ মহাশয়ও নানারূপে আমাদের সম্বর্ধনা করিলেন। তাঁহারা দুজনেই আচার্যকে ইংলণ্ডে থাকিয়া অধ্যাপক হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের হাওয়া ছাড়া তিনি কাজ করিতে অসমর্থ বলিয়া আচার্য তাঁহাদিগকে অসম্মতি জানাইলেন।

"ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিদ্‌দের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল, নানাস্থানে সান্ধ্য ভোজনে নিমন্ত্রিত হইলাম। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ডাক্তার গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের বাড়ীতে এইরূপে নিমন্ত্রিত এক ভদ্রলোক (যাঁহাকে ভারত-সচিব বিশেষজ্ঞ-স্বরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন) পার্শ্বস্থ বন্ধুকে বলিতেছেন—"এই 'চন্দ্র বসু' লোকটি যাহার কথা আজকাল লোকে এত বলিতেছে সে কে হে? ভারতীয় লোক আবার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিবে? অসম্ভব! তাহাদিগকে ছোট ছোট টেষ্ট টিউব দিয়া পরীক্ষা করাইয়া তাহার স্থানে বড় টেষ্ট টিউব দিলে আর তাহারা সেই পরীক্ষা করিতে পারে না!" পার্শ্বের লোকটি বিখ্যাত রাসায়নিক র‍্যাম্‌সে (Ramsay)। তিনি বলিলেন—"চুপ করো। তুমি কিছুই জানোনা, ভারতবাসী বহু শতাব্দীর সাধনাতে তাহাদের চিন্তাশক্তি এত প্রখর করিয়াছে যে চিন্তাশীলতায় তাহাদের সমকক্ষ হইতে আমাদের বহু দিন লাগিবে। আমাদের সৌভাগ্য যে, ইহারা এ পর্যন্ত নিজের হাতে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করে নাই। যখন শিখিবে তখন ব্রিটনের আধিপত্য চলিয়া যাইবে। তবে এই 'চন্দ্র বসু' দৈবক্রমে এরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধিতে আমাদের ভয়ের কারণ নাই।"

"ক্রমে গ্লাডষ্টোন পরিবারের সহিত আত্মীয়তা বাড়িয়া গেল, তাঁহাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনিতে লাগিলাম। ডাক্তার গ্লাডষ্টোন বিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সেবার জন্য বিবাহ করেন নাই। ইংলণ্ডে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কখনও

কন্যা পিতার জন্য, কখনও পুত্র মাতার জন্য আজীবন কৌমার্যব্রত পালন করেন। বর্তমান বাঙালী রাসায়নিকদের গুরু Dounan সাহেব বিবাহ করেন নাই, মাতা কুমারী ভগ্নীদের লইয়াই তাঁহার পরিবার। বিবাহের কথা তুলিতেই হাসিয়া বলেন, এমন মা ও বোন থাকিতে আমার তত্ত্বাবধান করিতে অন্য কাহারো কি আবশ্যকতা? বিবাহ করার খাতিরেই বিবাহ করার ভক্ত ইঁহারা নহেন। আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহারা জীবনপথে অগ্রসর হন।

"ইহার পরে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসনের শুক্রবাসরীয় বক্তৃতা দিবার জন্য আচার্য নিমন্ত্রিত হন। বক্তৃতা অন্তে Lord Raleigh (লর্ড রালে) বলিলেন যে, এরূপ নির্ভুল পরীক্ষা কখনও হয় নাই। দুই একটি ভুল হইলে মনে হইত যেন জিনিষটা বাস্তব; এ যেন মায়াজাল।"

রয়্যাল ইনষ্টিটিউসনে বক্তৃতার কথা প্রথমেই বলিয়াছি। এই সকল বক্তৃতার ফলে ভারত-সচিব এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, আচার্য জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষাদির সুবিধার জন্য তাঁহার ছুটি আরো তিন মাস বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

এই ছুটির শেষ ভাগে প্যারী ও বার্লিনের বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী জগদীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করিলেন। সর্বত্রই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ও পরীক্ষা দেখিয়া খুব প্রশংসা করিলেন। জার্মানীর এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অপর একজনকে (যিনি জগদীশ-চন্দ্রের আলোচ্য বিষয় লইয়া গবেষণা করিতেছিলেন) একদিন বলিতেছিলেন—"বোস্‌ তোমাদের জন্য আর কিছুই রাখেন নাই। এখন থেকে নূতন কিছু আরম্ভ কর।"

জগদীশচন্দ্র কিরূপ অসুবিধা ও অনুৎসাহের ভিতর দিয়া কাজ করিয়াছেন, তাহা বিলাতের একদল সহৃদয় বৈজ্ঞানিক বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ একটি ভাল রকম পরীক্ষাগারের

আচার্য জগদীশ

লণ্ডন রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনে যে টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডেভি, ফ্যারাডে প্রভৃতি জগদ্‌বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ১৮৯৮ সালে সেই টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন

অভাবে জগদীশচন্দ্রের কার্য যে কত ব্যাহত হইয়াছে, তাহা তাহারা বেশ বুঝিতে পারিলেন এবং ইহা দূরীকরণের জন্য লর্ড কেলভিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ভারত-সচিবের নিকট এক মান-পত্র প্রদান করিলেন। ভারত-সচিব ১৮৯৭ সালের মে মাসে উহা ভারত-গভর্নমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিলে তৎকালীন বড়লাট লর্ড এলগিন জগদীশচন্দ্রকে বলিলেন যে, তিনি এই প্রস্তাবে অত্যন্ত অনুরক্ত ইত্যাদি। যাহা হউক, তিনি এ বিষয়ে বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আলোচনা করিবেন। ইহার পর সুদীর্ঘ ১৭ বছর কাটিয়া গেল। জগদীশচন্দ্রের ভাগ্যে ভাঙ্গা টেষ্টটিউবই রহিল। তারপর ১৯১৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে একটি পূর্ণায়তন লেবরেটরী নির্মিত হইল। তখন আচার্যদেবের কলেজের কার্যকাল শেষ হইয়া আসিয়াছে।

বিলাতে অবস্থান কালে জগদীশচন্দ্রের মনে ভারতবর্ষে একটি বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্প জাগে। তাঁহার সহধর্মিণী অবলা বসু মহাশয়াও লিখিয়াছেন—'এই রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশনের কার্য-পদ্ধতি দেখিয়া তখন হইতেই আমাদের দেশে এরূপ কোন স্থান করিবার বাসনা আমার মনেও উদয় হইল এবং বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সূচনা ও কল্পনা তখন হইতেই আরম্ভ হইল।' এই জন্য আচার্য স্বীয় দৈনন্দিন ব্যয়-বাহুল্য কমাইয়া দিলেন এবং বিজ্ঞান-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের উপকরণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮৯৭ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বিদেশ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

বিজ্ঞান-আলোচনার সুবিধা প্রদানের জন্য জগদীশচন্দ্র বড়লাট লর্ড কার্জনকে লিখিয়াছিলেন। লর্ড কার্জন এ বিষয়ে মতামতের জন্য ইংলণ্ডের চারি জন বৈজ্ঞানিকের নিকট লিখেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই জন জগদীশচন্দ্রকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব সমর্থন করেন। অপর দুই জন জগদীশচন্দ্রের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ও শত্রুতাভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহারা অমত করিলেন। কার্জন তখন জগদীশচন্দ্রকে সি-আই-ই উপাধি দ্বারা সন্তুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনা তো রাজ-উপাধিতে তুষ্ট হইবার নয়।

সাধনা ও সংগ্রাম—বিদেশে দ্বিতীয় অভিযান

"সম্মুখে অনেক আশা ও নৈরাশ্যের কারণ আছে। দেশ ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া অবসাদে মন আক্রান্ত।

"এ সময় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব চলিয়া যায়। কখনও মহীয়সী মাতৃ-দেবীর অনুজ্ঞা শুনিতে পাই। তাঁহার ভৃত্য পদধূলি মস্তকে লইয়া যাত্রা করিবে। আপনারা আশীর্বাদ করুন, ভৃত্য যেন কায়মনোবাক্যে সেবা করিতে পারে, তাহার ক্ষুদ্র শক্তি যেন বর্ধিত হয়।"

— আচার্য জগদীশচন্দ্র

স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া জগদীশচন্দ্র পুনরুদ্যমে কার্য আরম্ভ করিলেন এবং কতকগুলি নূতন আবিষ্কার করিলেন। এই সময়েই তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত উদ্ভিদ্‌বিষয়ক আবিষ্ক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, জগদীশচন্দ্র প্রথমে বিদ্যুৎসম্বন্ধীয় গবেষণাই করিতেন। কিন্তু কি করিয়া তিনি এই মূক উদ্ভিদ্‌ জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন সেই কথাই বলিতেছি।

তিনি লিখিয়াছেন—"তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম, দেখিলাম হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়া-লিপিতে সেই একই রূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া একেবারে অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি, জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম।

উদ্ভিদে এই সব প্রক্রিয়া অধিকতর রূপে পরিস্ফুট দেখিলাম।"

সেই হইতে আমরণ এই মূক প্রাণীই জগদীশচন্দ্রের জীবন-সঙ্গী ছিল।

১৯০০ সালের প্যারি প্রদর্শনী হইতে জগদীশচন্দ্রের নিকট নিমন্ত্রণ-পত্র আসে আন্তর্জাতিক পদার্থ-বিদ্যাবিষয়ক সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য। জগদীশচন্দ্র লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নরের নিকট আবেদন জানাইলেন। কিন্তু এই ব্যাপার লইয়াও জগদীশ-চন্দ্রকে কম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। অপ্রীতিকর হইলেও আচার্যের নিজের চিঠি হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি। বিজ্ঞানের সাধনায় যাঁহারা তপস্বী সাজিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ ঝঞ্চাট কী যে ক্লেশকর ও তাঁহাদের বিজ্ঞান-চর্চার কত যে ক্ষতিকর তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিবেন। জগদীশচন্দ্রের এই চিঠিগুলি হইতে তাঁহার অন্তরলোকের ব্যথা ও অশ্রুর পরিচয় পাই। বাহিরে যিনি ধীর, স্থির ও মৌন তপস্বী, ভিতরে তাঁহাকে যোদ্ধৃবেশে কত যে সংগ্রাম ও বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। আবাল্যের বন্ধু রবীন্দ্রনাথের নিকট তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আপনারা আমার প্যারি কংগ্রেসে যাওয়া উচিত বলিয়াছিলেন। তাঁহার (লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নরের) অনুগ্রহ দেখিয়া আমি সে কথা বলিলাম, আর যে নিমন্ত্রণ-পত্র আসিয়াছে সে কথা উল্লেখ করিলাম। লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর বলিলেন যে তিনি যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য করিবেন, তবে এ বিষয় ভারত-সচিবের হাতে।

"গত সপ্তাহে আমার বিশেষ উৎসাহে গিয়াছিল, আর আজ কোন নূতন experiment (পরীক্ষা) আশাতীতরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই মুহূর্তেই ডিরেক্টরের নিকট হইতে পত্র পাইলাম যে—'I am informed you had an interview with the Lt. Governor and have asked to be deputed to Paris Exhibition, to attend a meeting of European scien-

tists. May I ask you to inform me of the reasons for making your request to his Honour?' এরূপ দুরাশা করিবার reason (কারণ) কি, ইহার explanation (জবাব) কি দিতে হইবে জানি না।

"আমাদের কর্মফল অনেক এবং অনেক দুরাশা আমাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত করে।"

ইহার চারি দিন পরে আর একখানি চিঠিতে লিখিতেছেন—

"আজ ডিরেক্টার লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তুমি আমার চিঠি ভুল বুঝিয়াছ।

"তবে প্যারি যাইবার কথা উঠিলে দেখিলাম, পূর্ব ভাব অল্প অল্প ফিরিয়া আসিতেছে। বলিলেন যে, ইহার পরে গেলে হয় না? 'The only difficulty is that there is no one who can take up your work during your absence, the college will suffer', etc. আমি যে ইতিপূর্বে গিয়াছিলাম এবং তখনও কলেজ এক প্রকার চলিয়াছিল, একথা জানা থাকিতেও যখন আপত্তি করিলেন, তখন আমি আর কি করিব? তারপর বলিলেন যে, Send me your letter of invitation from Paris and I will send a report. বলিতে লজ্জিত হইতেছি যে সেই নিমন্ত্রণ-পত্র অনেকদিন আমার পকেটে থাকিয়া সম্ভবতঃ ধোপাবাড়ী গিয়াছে। অন্ততঃ আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। এরূপ অবস্থা কিরূপ শোচনীয় মনে করিতে পারেন। আমি বলিলাম, 'যদি পাঁচ সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে পারেন, তবে নূতন একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র হাজির করিতে পারি। কিন্তু সেই চিঠি এখন না হইলে নাকি চলিবে না। যাওয়ার আর কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

যাহা হোক্, এইরূপ অবস্থায় তিন মাস কাটিয়া গেল। ১৯০০ সালের জুন মাসে ভারত-সচিবের মঞ্জুর টেলিগ্রাম আসিল।

জুলাই মাসে জগদীশচন্দ্র প্যারি অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে যাইয়া প্যারিতে পৌঁছিলেন।

প্যারির এই প্রদর্শনীতে স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র,—এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জন-সঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতির বুধমণ্ডলীমণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহুগৌরবর্ণ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন,—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস। একা, যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করিলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিক-মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী, সাধ্বী, সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙালীর গৌরববর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি।"

প্যারি সম্মেলনে ভারতের যোগ্যতম প্রতিনিধি তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তাঁহার বলিবার বিষয় ছিল—"জীব ও জড় পদার্থের উপর বৈদ্যুতিক সাড়ার একতা।" কথাটা জগদীশচন্দ্রের ভাষায়ই একটু পরিষ্কার করিয়া বলি।

"প্রতিদিন এই যে অতি বৃহৎ উদ্ভিদ্‌জগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, ইহাদের জীবনের সহিত কি আমাদের জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে? উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা ইহাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চান না। বিখ্যাত বার্ডন সেণ্ডারসন বলেন যে, কেবল দুই চারি প্রকারের গাছ ছাড়া সাধারণ বৃক্ষ, বাহিরের আঘাত, দৃশ্যভাবে কিংবা বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যের দ্বারা সাড়া দেয় না। আর লাজুক জাতীয় গাছ যদিও বৈদ্যুতিক সাড়া দেয় তবু সেই সাড়া জন্তুর সাড়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফেফর প্রমুখ উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রের অগ্রণী পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, বৃক্ষ স্নায়ুহীন, আমাদের স্নায়ুসূত্র যেরূপ বাহিরের বার্তা বহন করিয়া আনে, উদ্ভিদে এরূপ কোন সূত্র নাই।

"ইহা হইতে মনে হয়, পাশাপাশি যে প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌জীবন প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি, তাহা বিভিন্ন নিয়মে পরিচালিত উদ্ভিদ্ জীবনে বিবিধ সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ—সেই দুরূহতা ভেদ করিবার জন্য অতি সূক্ষ্মদর্শী কোন কল এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

কাজেই "প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে কল্পনাকে ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রশ্ন করিতে হইবে, এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের স্বহস্ত লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

"বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আমরা কি করিয়া জানিব? যদি কোন অবস্থা গুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয়, বা অন্য কোন কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয়, তবে এই সব ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্তন আমরা বাহির হইতে কি করিয়া বুঝিব? তাহার একমাত্র উপায়—সকল প্রকার আঘাতে গাছ যে সাড়া দেয় তাহা কোন প্রকারে ধরিতে ও মাপিতে পারা।

"যদি গাছ তাহার লেখনীযন্ত্রের সাহায্যে তাহার বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিত, তাহা হইলে বৃক্ষের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করা যাইত।

"বৃক্ষের বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার বিবিধ সূক্ষ্মযন্ত্র নির্মাণ দশ বৎসর পূর্বে কল্পনামাত্র ছিল, তাহা এই কয় বছরের চেষ্টার পর কার্যে পরিণত হইয়াছে। এই বিবিধ কলের সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হইবে; বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্তে মুহূর্তে নির্ণীত হইবে; তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হইবে এবং জীবন ও মৃত্যুরেখা তাহার আয়ু পরিমিত করিবে। এই কলের আশ্চর্য শক্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার সাহায্যে সময় গণনা এত সূক্ষ্ম হইবে যে এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের এক ভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইবে। যে কলের নির্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান্ দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই কল আমাদের দেশে আমাদেরই কারিকর দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে। ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ আমাদের স্বদেশীয়।

"এইরূপ বহু পরীক্ষার পর বৃক্ষ-জীবন ও মানবীয় জীবন যে একই নিয়মে পরিচালিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

জগদীশচন্দ্রের উপরি-উক্ত বক্তব্য হইতেই গাছের সাড়া সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা হইবে।

প্যারি সম্মিলনের পরেই জগদীশচন্দ্র যে চিঠিখানা লিখিয়াছিলেন, তাহারই খানিকটা বলিতেছি।

"প্রথমতঃ, আমি দেরীতে পৌঁছিয়াছি এবং আমি যে বিষয় বলিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা Royal Societyতে শেষ মুহূর্তে পৌঁছিয়াছিল, সুতরাং তাহা publish এখনও হয় নাই। এজন্য সে বিষয়ে বলিতে পারি কিনা জানিতাম না। সে যাহা হউক, একদিন কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হঠাৎ আমাকে বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকে অতিশয় আশ্চর্য হইলেন। তারপর কংগ্রেসের সেক্রেটারী (তিনি ইংরাজী জানেন) আমার নিকট আমার বিষয়টির পূর্ণ বিবরণ চাহিলেন, তিনি ফরাসী ভাষায় তর্জমা করিবেন। এই উপলক্ষে

তিনি আমার সহিত দেখা করিতে আসেন এবং আমার কাজ লইয়া আলোচনা করেন। এক ঘণ্টা পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—But monsieur, this is very beautiful. তারপর আরো তিন দিন এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়, প্রত্যহই more & more excited—শেষদিন আর নিজকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কংগ্রেসের অন্যান্য সেক্রেটারী এবং প্রেসিডেণ্টের নিকট অনর্গল ফরাসী ভাষায় আমার কার্য সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। পরিশেষে আমাকে বলিলেন যে, আপনার বিষয়টী অক্ষরে অক্ষরে নূতন ; এই theory প্রচার করিতে অন্ততঃ দু'বৎসর লাগিবে। সব একবারে প্রচার করিবেন না—এত Surprise লোকে একবারে ধারণা করিতে পারিবে না।"

য়ুরোপীয় জাতিগুলির বিজ্ঞান-চর্চায় কী উদ্যম-উৎসাহ তাহা জগদীশচন্দ্রের চোখে ধরা পড়িয়াছিল, আর সেই সঙ্গে মনে পড়িয়াছিল তাঁহার নিরুদ্যম কর্ম্মকুণ্ঠ দেশবাসীর কথা। তাঁহার সে কথাটুকু আমাদের ছেলেমেয়েদের নিকট বড়ই অমূল্য। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"প্যারিসে যা যা দেখিলাম, তাহাতে যেমন নূতন বিজ্ঞানের প্রভাব দেখিয়া সুখী হইয়াছি, তেমনি দেশের কথা মনে করিয়া নিরুৎসাহ হইয়াছি। এই ভয়ানক জীবন-সংগ্রাম নির্মম বিরামহীন—এই সংগ্রামে যাহারা একটু পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, তাহারা একদিন নির্মূল হইবে। এখানে কি ব্যগ্রতা! একটি নূতন আবিষ্কার হইল, আর অমনি তাহা কাজে লাগিল। যাহারা সর্বপ্রথম তাহার ব্যবহার শিখিল, তাহারা অন্য জাতিকে ব্যবসায়ে এবং manufactureএ পরাস্ত করিল। পৃথিবী ব্যাপিয়া এই সংগ্রাম অহোরাত্র চলিতেছে। নির্মম প্রকৃতি! আমাদের ন্যায় উদ্যমহীন, অকর্মঠ জাতি আর কত কাল বাঁচিয়া থাকিবে? এ সব মনে করিয়া মনের জ্বালা সম্বরণ করা অসম্ভব। সম্মুখে আশার আলো দেখিলে

মনে উৎসাহ আসে, কিন্তু ব্যর্থ উদ্যম লইয়া কে জীবন বহিতে পারে?"

"এই গেল প্যারিসের পালা। তারপর লণ্ডনে আসিয়াছি। এখানে একজন physiologist আমার কার্যের জনরব শুনিয়াই বলিলেন যে, কখনও হইতে পারে না। There is nothing common between the living & the nonliving। আর একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ৪ ঘণ্টা কথা হইয়াছিল। প্রথম ঘণ্টায় ভয়ানক বাদানুবাদ। তারপর কথা না বলিয়া কেবল শুনিতেছিলেন এবং ক্রমাগত বলিতেছিলেন, This is magic! This is magic! তারপর বলিলেন, এখন তাঁহার নিকট সমস্তই নূতন, সমস্তই আলোক। আরও বলিলেন, এই সব সময়ে accepted হইবে; এখন অনেক বাধা আছে। আমার theory পূর্ব সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং কোন কোন physicists, কোন কোন chemists এবং অধিকাংশ physiologists আমার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। কোন কোন মহামান্য বৈজ্ঞানিকের theory (মত), আমার মত গ্রাহ্য হইলে মিথ্যা হইবে।"

এই সময়ে জগদীশচন্দ্রকে বিষম সংগ্রাম ও সঙ্কটের মধ্যদিয়া যাইতে হইয়াছে। একদিকে তাঁহার শরীরের গুরুতর পীড়া, অপরদিকে য়ুরোপীয় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের ষড়্যন্ত্র তাঁহারই বিরুদ্ধে। অত্যন্ত সাহস ও অসীম ধৈর্যের সহিত জগদীশচন্দ্র ইহাদের বিরুদ্ধে যুঝিয়াছেন। লণ্ডনের ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে একদিনের বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"প্রোঃ লজ (Prof. Lodge) আমার theoryর (মত) প্রতিবাদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া আসিয়াছিলেন—তাঁহার বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন, অন্যদিকে আমার পরিচিত কেহ ছিল না। আমার theory বুঝাইতে হইলে অন্যূন তিন ঘণ্টা আবশ্যক। অতি কষ্টে এক ঘণ্টায় যতটুকু হয় তাহা ভাবিয়া গিয়াছিলাম। সেদিন

৮টি প্রবন্ধ ছিল, গড়ে ১৫ মিনিট করিয়া বলিতে দেওয়া হইবে, হঠাৎ এই সংবাদ শুনিলাম। ১৫ মিনিটে কি বলিব?

"আমার প্রবন্ধের মুখবন্ধে দুই theory লইয়া বাদানুবাদ আর আমার সম্মুখেই লজ! কি করিব?

"১৫ মিনিটের অধিক সময় নাই, কেবল কয়েকজন expertsকে (বিশেষজ্ঞকে) উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলাম। সকলেই লজ-এর মুখের দিকে তাকাইতেছিলেন, আমিও এক একবার দেখিতেছিলাম। জন বুলের মনের ভাব মুখে প্রকাশ পায় না। তবে যখন শেষ হইল, বহু প্রশংসাধ্বনি শুনিলাম, প্রেসিডেণ্ট বলিলেন, কলিকাতার 'চন্দ্র বসু' আমাদের সকলেরই সুপরিচিত ইত্যাদি। তারপর বলিলেন, যদি কাহারও কিছু প্রতিবাদ করিবার থাকে তবে এই সময়।

"না, প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। তারপর লজ উঠিয়াও প্রশংসা করিলেন এবং বসু-জায়ার নিকট যাইয়া বলিলেন, 'Let me heartily congratulate you on your husband's splendid work."

তাঁহার এই বক্তৃতায় লোকে এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, পরদিন এক অধ্যাপক তাঁহাকে ইংলণ্ডে থাকিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে এবং অধ্যাপনা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু জগদীশ চন্দ্রের অন্তরের মণি-কোঠায় দেশ-জননীর ম্লান মুখচ্ছবি সর্বদা সজাগ ছিল। তাই এই অবস্থায় পড়িয়া তিনি তাঁহার বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—

"একদিকে আমার কাজের জন্য অসীম পরিশ্রম ও অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। অন্যদিকে আমার সমস্ত মন প্রাণ দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করিতে পারে না। আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত inspiration (অনুপ্রেরণার)-এর মূলে আমার স্বদেশীয় লোকের স্নেহ। সেই স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল?"

• কাজেই, জগদীশচন্দ্র বিদেশে কোন চাকরী গ্রহণ করিতে পারিলেন না। য়ুরোপে গবেষণার সুবিধার জন্য তাঁহার ছুটি আরো দুই বছর যাহাতে বাড়াইয়া দেওয়া হয়, সেই জন্য ইণ্ডিয়া আফিসে আবেদন করিলেন। কিন্তু ভারত-সচিব দুঃখ প্রকাশ করিয়া জবাব দিলেন এই বলিয়া যে, যদিও তাঁর scientific work is very important, yet the Secretary of State regrets ইত্যাদি। অগত্যা তিনি কম বেতনে ছুটি চাহিলেন। জগদীশচন্দ্র বড় দুঃখে লিখিয়াছিলেন—

"আমার মনও নানাকারণে ম্রিয়মাণ। Extension পাইলাম না, ফার্লোর জন্য আবেদন করিয়াছি, তাহাও পাই কিনা সন্দেহ। এরূপ অবস্থাতে কাজ ফেলিয়া গেলে যে, পুনরায় সূত্র ধরিতে পারিব না, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতেছি। আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়া যে সব আলোক রেখা দেখিতেছি, তাহা একবার মুছিয়া গেলে আর কখনও পাইব না। জার্মানী ও আমেরিকায় যাওয়ার বিশেষ আবশ্যক ছিল, কিন্তু তাহা কি করিয়া হইবে জানি না।

"আমি এখন ভাবে আবিষ্ট হইয়া আছি। তাহা যদি কিছু-দিনের জন্য ছাড়িয়া দেই, তবে সূত্র পুনরায় ধরিতে পারিব কিনা ভয় হয়। এই দেখ, এইমাত্র একটি আশ্চর্য experiment (পরীক্ষা) করিয়া আসিলাম। জন্তু এবং অজীবের মধ্যে ভয়ানক মস্ত একটা ব্যবধান। তাই সেতু বাঁধিবার জন্য উদ্ভিদের জীবন-স্পন্দন-রেখা আছে কিনা তার চেষ্টা করিতেছিলাম। এইমাত্র অত্যাশ্চর্য পরীক্ষার ফল পাইলাম—এক! এক! সব এক! উদ্ভিদ্‌কে মধ্য-স্থলে দাঁড় করাইয়া আমি দুই দিকে আক্রমণ করিব—একই কল, একই লিখিবার যন্ত্র—কেবল এই মাত্র উদ্ভিদ্, পর মুহূর্তে জীবী, পর মুহূর্তে অজীবীকে রাখিয়া দেখাইব—একই হস্তলিপি! তুমি কি ভাবিয়া দেখিয়াছ ইহার অন্ত কোথায়? কত বিজ্ঞান একীভূত হইবে? বিষ প্রয়োগে কেন জীবনান্ত হয়? বিষ খাইয়াছে—

মরিয়াছে, সব গোলমাল চুকিয়া গেল। কিন্তু কেন মরিল? কি মানবিক কলে চাবি পড়িল? কেন পড়িল, চাবি কি ঘুরাইয়া দেওয়া যায় না? কেন যাবে না? এসব কথা ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তোমার ডাক্তারী, তোমার ঔষধ-ব্যবহারের কিছু অর্থ আছে? কেন থাকিবে না? অর্থ যদি বোঝা যায়, তবে এই সব পরীক্ষা দ্বারা যাইবে। বন্ধু, আমি শত জীবনে ইহা চিন্তা করিতে পারিব না—আমি সব দেখিতেছি—কেবল সময়াভাব। আমি কি করিয়া এসব ফেলিয়া একদিনের জন্যও চলিয়া আসি।"

পরাধীন দেশের লোক বলিয়াই বিদেশী শাসনযন্ত্র এমন নির্মমভাবে বৈজ্ঞানিক কার্যে বাধা দিয়াছেন। কোন স্বাধীন দেশে জগদীশচন্দ্রের মত মনীষী জন্মগ্রহণ করিলে, সকল রকম সুযোগ-সুবিধা অযাচিতভাবে তাঁহার দ্বারে আসিত। যাহা হোক্, 'বহু কষ্টে এক বৎসরের ফার্লো' পাইলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার 'বেতন যেরূপ ভাবে কাটা হইয়াছিল তাহাতে বিদেশে থাকিয়া কাজ করা দুরূহ' হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার উপর পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধাচরণ ও ষড়্যন্ত্র জগদীশচন্দ্রকে বিষম ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সে ঘটনা তিনি বড় দুঃখেই লিখিয়াছিলেন। ঘটনাটি এই—

"Sanderson এবং Waller এই দুই জন Physiologyর উচ্চ সিংহাসন অনেক কাল যাবৎ নির্বিবাদে অধিকার করিয়াছিলেন।

"আমি Royal Societyতে যখন বক্তৃতা করি, তাঁহাদিগকে দেখাই যে, যদি নির্জীব ও জন্তুর Responsiveness এর একই আধার হয়, তাহা হইলে মধ্যবর্তী উদ্ভিদের responseও একই রকম হইবে। তাহাতে Burden Sanderson বলিয়া উঠিলেন, আমি উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে সমস্ত জীবন অনুসন্ধান করিয়াছি, কেবল লজ্জাবতী লতা সাড়া দেয়। কিন্তু that ordinary plants should give electrical response is simply impossible. It cannot

be. আরও বলিলেন, Prof. Bose has applied physiological terms in describing his physical effects on metals. Though his paper is printed, yet we hope he will revise it and use physical terms and not use *our* physiological expressions in describing phenomena of dead matter.

"তাহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, Scientific terms কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে ; আর এই সব phenomena এক, সুতরাং আমি একের মধ্যে বহুত্ব প্রচারের বিরোধী।

"ফল হইল যে, আমার সেই Paper প্রকাশ বন্ধ হইল। কয়জন Physiologistএর প্রাণপণ চেষ্টায় Conspiracy of silence হইল। কারণ, আমার এই থিয়োরী স্থির হইলে উক্ত বৈজ্ঞানিকদের theory একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়।

"ইতিমধ্যে Linnean Societyর President Prof. Vinesএর সহিত আমার দৈবক্রমে দেখা হয়। Linnean Society, Biology সম্বন্ধে সর্বপ্রধান Society। তিনি উক্ত সভায় আমাকে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন।

"সমবেত Physiologist-Biologist প্রমুখ বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী, তাহার মধ্যে তোমার বন্ধু একাকী সেই প্রতিপক্ষ-কুলের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত। ১৫ মিনিটের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে, রণে জয় হইয়াছে। Bravo! Bravo। ইত্যাদি অনেক উৎসাহ বাক্য শুনিলাম। বক্তৃতার পর President তিন বার উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার আছে কি? একেবারে নিরুত্তর।

সুতরাং এতদিন পর আমার এই প্রথম সংগ্রামে কৃতকার্য হইয়াছি।"

য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের ঘৃণিত পরশ্রীকাতরতা ও কুৎসিত ষড়্‌যন্ত্রের কথা অবলা বসু মহাশয়া লিখিয়াছিলেন—

"আমরা দূর হইতে ইয়োরোপকে সমুদয় সদ্‌গুণের আধার বলিয়া মনে করি, কিন্তু দুই তিন বৎসর ইহাদের সঙ্গে থাকিলে অভ্যন্তরের খবর যাহা পাওয়া যায়, আমাদের দেশ কোথায় পড়িয়া আছে। এখানে Scientific menদের মধ্যে যেরূপ intrigue এবং দ্বেষ, তাহা শুনিয়া অবাক্ হই।"

য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ যে স্বার্থ-সাধনের জন্য কত নীচ হইতে পারেন, তাহা শুনিলে বাস্তবিকই অবাক্ হইতে হয়। জগদীশচন্দ্রেব সঙ্গে যে কী কুৎসিত ব্যবহার তাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহার কাজে কত বাধা-বিপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহারই চরম প্রকাশ ওয়ালার ও স্যাণ্ডারসন সাহেবের চক্রান্ত। কিন্তু এই চক্রান্ত করিয়াই যদি জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধ প্রকাশ বন্ধ রাখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলেও বরং ভাল ছিল। কিন্তু ওয়ালার সাহেব সেই প্রবন্ধ চুরি করিয়া নিজ নামে ছাপিয়া প্রকাশ করিলেন। বড় দুঃখে জগদীশচন্দ্র সেকথা লিখিয়াছেন—

"বন্ধু, তুমি আমার নিকট উপস্থিত হও। আমি কি কষ্টের ভিতর দিয়া যাইতেছি তুমি জানিবে না। তোমরা নিরাশ হইবে একথা মনে করিয়া আমি এখানে কিরূপ বাধা পাইতেছি তাহা জানাই নাই। তুমি মনেও করিতে পার না। এই যে Royal Societyতে গত বৎসর মে মাসে Plant Response সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, Waller ও Sanderson চক্রান্ত করিয়া তাহার publication বন্ধ করিয়া দিলেন। আমার সেই আবিষ্কার চুরি করিয়া Waller গত নবেম্বর মাসে এক কাগজে বাহির করিয়াছেন। আমি এতদিন জানিতাম না। আমার Linnean Societyর paper ছাপা হইবার কথা যখন Councilএ উঠে, তখন Wallerএর বন্ধুরা তথায় আমার paper বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন এই বলিয়া যে

Waller গত নবেম্বরে একথা publish করিয়াছেন। Council এর কথা confidential, সুতরাং এসব চক্রান্ত আমি জানিতাম না। আর Royal Societyর paper বাহিরে প্রচার হয় নাই, সুতরাং প্রমাণাভাবও বটে। ভাগ্যক্রমে আমার Royal Instituteএর lectureএ একথা ছিল, এবং দৈবক্রমে Linnean Societyর সেক্রেটারীর কাছে আমার উক্ত কাগজ ছিল। অনেক ঝগড়ার পর শুনিতে পাইতেছি যে আমার কাগজ ছাপা হইবে।

"এতদিন এদেশের বিজ্ঞান-সভায় অনেক বিশ্বাস করিয়াছি—তাহা দূর করিয়া লাভ কি? অধিক দিন থাকিতে পারিলে আমি একাই ব্যূহ ভেদ করিতাম—কিন্তু আমার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি একবার কদিন ভারতের মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া জীবন পাইতে চাই।"

১৯০২ সালের আগষ্ট মাসে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

স্বদেশ ও সাহিত্য

"আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক বার হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।"

—আচার্য জগদীশ

"যে হতভাগ্য আপনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে পর-অন্নে পালিত হয়, জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।"

—আচার্য জগদীশ

য়ুরোপের এই কলুষিত আবহাওয়ায় জগদীশচন্দ্রের চিত্ত সর্বদা ভারতের পবিত্র ও শান্ত প্রতিচ্ছবির দিকে উন্মুখ হইয়া থাকিত। দেশপ্রেম শুধু রাজনীতি বা সমাজ-সেবাতেই আবদ্ধ নয়। জগদীশ-চন্দ্রের দেশপ্রেম তাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিজ্ঞান-চর্চাদ্বারা দেশকে জগতের সমক্ষে বড় করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার আবাল্যের সঙ্কল্প—জপ, তপ, আরাধনা। তাই দেখি বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের মর্মের অন্তস্থলে স্বদেশ-প্রীতির স্বচ্ছ ফল্গুধারা নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে। এমন আত্মহারা হইয়া মাতৃরূপে দেশকে কয়জনে ভালবাসিতে পারে? তাঁহার দেশপ্রেমে তরঙ্গায়িত উচ্ছ্বাস নাই, কিন্তু গভীরতা আছে।

য়ুরোপের দ্বারে আঘাত খাইয়া তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি জাগে নাই। উহা তাঁহার জীবনের চিরন্তন সম্পদ্। তবে য়ুরোপের নগ্ন স্বার্থান্ধতায় তাঁহার অনেকখানি ভুল ভাঙ্গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই তিনি বিলাত হইতে লিখিয়াছিলেন—

"আমি এতদিনে আমাদের জাতীয় মহত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছি। স্বদেশীয় আত্মম্ভরি ও বিদেশীয় নিন্দুকের কথায় চক্ষে আবরণ পড়িয়াছিল—এখন উন্মুক্ত চক্ষে যাহা প্রকৃত তাহাই দেখিতেছি।
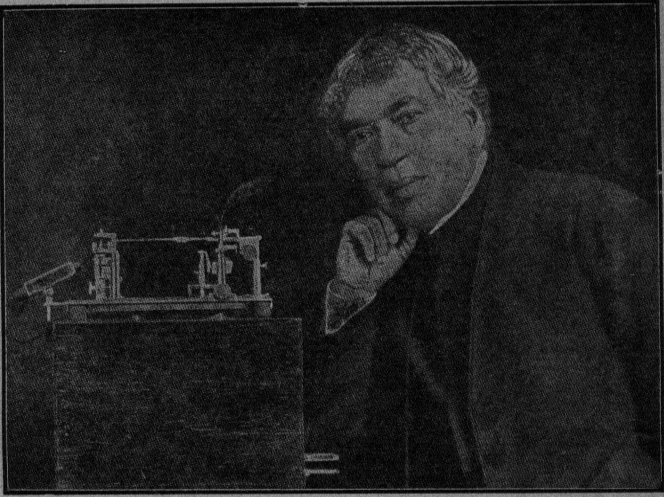
'তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্ত মাঝে কহে আজি কথা,
তরুর মর্ম্মের সাথে মানব মর্ম্মের আত্মীয়তা।'

অঙ্কুরিত বীজের উপর পাথর চাপা দিলে, প্রস্তর চূর্ণীকৃত হয়। সত্য ও জ্ঞানকে কেহ পরাভব করিতে পারে না।

"ছেলে-বেলা ইংরেজী শিক্ষার সহিত যে পাক পড়িয়াছিল, এতদিনে তাহা আস্তে আস্তে খুলিয়াছে, এখন স্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া সব দেখিতে পাইয়া অনেক মোহ দূর হইয়াছে।"

বিলাতে অধ্যাপক র‍্যাম্‌সে বলিয়াছেন, ভারতীয়দের দ্বারা বিজ্ঞান-চর্চা সম্ভব নয়; "কাহার কাহার মনে হইতে পারে যে এখন হইতে ভারতে নূতন জ্ঞান-যুগ আরম্ভ হইল; কিন্তু একটি কোকিলের ধ্বনিতে বসন্তের আগমন মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।" জগদীশচন্দ্র সেদিন স্পর্ধার সহিতই উত্তর দিয়াছিলেন—"আপনাদের আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, শীঘ্রই ভারতের বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে শত কোকিল বসন্তের আবির্ভাব ঘোষিত করিবে।"

এমন করিয়াই জগদীশচন্দ্র মাতৃভূমির মর্যাদা ও গৌরব রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইতেন। ভবিষ্যৎ ভারতের সোনার স্বপ্ন তাঁহার মানস চক্ষে সর্বদা ভাসিয়া বেড়াইত। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, আমাদের দেশে অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে তপস্বীর অভাব দেখা যাইবে না। আমাদের কি ভবিষ্যতে কিছুই আশা নাই? চিরকালই কি মাথা নোয়াইয়া থাকিতে হইবে?"

"সচরাচর শুনিতে পাই হিন্দু স্বভাবতঃই সংসারবিমুখ, জীবন-সংগ্রাম হইতে পলাতক। একথা কি ঠিক? হিন্দুরা কি সমস্ত জীবন-শক্তি দিয়া অভীষ্টের অনুসন্ধান করে নাই? এত জ্ঞান আহরণ কি বিনা চেষ্টায় হইয়াছে? শঙ্করাচার্যের বিজয়-যাত্রা কোন্‌ অংশে যুদ্ধ-যাত্রা অপেক্ষা কম? এরূপ শারীরিক ও মানসিক শক্তির চরম প্রয়োগ একালে কি দেখা যায়?"

পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে যখন তাঁহার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল, সেই সময় জগদীশচন্দ্র বড়ই আক্ষেপে লিখিয়াছিলেন—

"আমার সর্বাপেক্ষা ক্ষোভ এই যে, আমাদের প্রকৃত গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া ভুলিয়া আছি। এখন এসব দেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছি, এখন অনেক বুঝিতে পারি। অন্য কোন্ দেশে সভ্যতা এতদূর নিম্নস্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে? অন্য কোন্ জাতি অনার্যকে আর্য করিতে পারিয়াছে? অন্য কোথায় নিম্নস্তর পর্যন্ত পুণ্য এরূপ প্রসারিত হইয়াছে?"

তখন বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প মাত্র জাগিয়াছে, সেই সময়ে লিখিয়াছিলেন—

"ইচ্ছা ছিল, ভারতবর্ষ হইতে এক নূতন School of Workers হইতে সম্পূর্ণ নূতন বিষয় প্রকাশিত হইবে। তাহা হইলে এক বিষয়ের কলঙ্ক চিরকালের জন্য মুছিয়া যাইত।

"এই পরীক্ষাগার থাকিলে ভারতবর্ষকে পুণ্যক্ষেত্র করিতে পারিতাম। কেবল আমাদের দেশ হইতে আমার শিষ্য দ্বারা জগতে একটি সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত হইত।"

এই সঙ্কল্প পরবর্তী কালে সফল হইয়াছে। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের কথা পরে বলিতেছি।

ভারতবর্ষের জন্য তাঁহার প্রাণ কিরূপ কাঁদিত, তাহার পরিচয় পাই এই কয়টি কথায়—

"আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যে সব বাঁধা পড়িবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিব।

"তোমাদের স্নেহের প্রতিদান করিতে আমি অসমর্থ। আমি অনেক সময়ে একেবারে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ি; কিন্তু তোমাদের জন্য আমি বিশ্রাম করিতে পাই না। আমাদের এরূপ

বাঁধিয়াছ। তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসন-পরিহিতা মূর্তি সর্বদা দেখিতে পাই! তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই।”

এই দুঃখিনী মাতৃভূমির মলিন ছবি জগদীশচন্দ্রের চোখে সর্বদা ভাসিয়া বেড়াইত। তাই তাঁহার মুখেই শোভা পায় এমন কথা—“যে মৃত্তিকাতে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে, সেই জন্মভূমির জন্য আমাদের দেহ মন পর্যবসিত হয়, ইহা ব্যতীত আর আমাদের কবিবার নাই।”

“পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ—ইহার অর্থ বুঝিতে অনেক সময় লাগে। ভারতের কল্যাণ আমাদের হাতে, আমাদের জীবন দিয়া আমাদের আশা, আমাদের সুখ-দুঃখ আমরাই বহন করিব। মিথ্যা চাকচিক্যে যেন আমরা ভুলিয়া না যাই ; যাহা প্রকৃত, যাহা কল্যাণকর তাহাই যেন আমদের চির-সহচর হয়। বিদেশে যাহা উন্নতি বলে, তাহার ভিতর দেখিয়াছি। আমরা যেন কখনও মিথ্যা কথায় না ভুলি—‘পুণ্য’ই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। অন্তরে কিংবা বাহিরে প্রতারণা দ্বারা আমরা কখনও প্রকৃত ইষ্টলাভ করিব না।”

জগদীশচন্দ্রের এই কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার স্বদেশপ্রীতি কত উন্নত, মহান্ ও উদার ছিল! যাহা-কিছু ভারতীয় তাহা তাঁহার প্রাণে এক নব আনন্দ দান করিত। তাই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি দেখি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা। তিনি লিখিয়াছেন—

“সৌভাগ্যক্রমে আমাদের জাতীয় জীবনে পুরাতনকাল হইতে যে এক ছাপ পড়িয়াছে তাহা কখনও মুছিয়া যাইবে না। তাহা হইতে আমরা প্রকৃত ও অপ্রকৃতের ভেদ বুঝিতে পারিব।”

“সেই চিরন্তন সত্য ভারতের প্রতি গহন ও গিরিগহ্বর হইতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।”

জগদীশচন্দ্র আমাদের জাতির বর্তমান সমস্যাগুলি সম্বন্ধেও চিন্তা করিয়াছেন এবং কর্মপন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। আজিকার দিনে অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি গঠনমূলক বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা তিনি দেশের লোকের নিকট স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। একটু বলি, শোন—

"আর এই যে সম্মুখে ম্যালেরিয়াতে জনপদ নির্মূল হইতেছে। বিবিধ সংক্রামক রোগ যেন দেশকে একেবারে বিধ্বস্ত করিতে চলিল। স্কুল বৃদ্ধি অতি মন্থর গতিতে হইতেছে। এই সব একেবারে অনিবার্য নয়, আমাদের অজ্ঞতা ও চেষ্টাহীনতার বিষময় ফল। আমাদের সর্বসাধারণে শিক্ষাবিস্তারের চিরন্তন প্রথা কথকতা দ্বারা। পর্যটনশীল মেলা দেশের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিনেই অন্য প্রান্তে পৌঁছিতে পারে। এই মেলায় স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ছায়াচিত্র-যোগে উপদেশ, স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম প্রচলন, যাত্রা, কথকতা, গ্রামের শিল্পবস্তুর সংগ্রহ, কৃষি-প্রদর্শন ইত্যাদি গ্রামহিতকর বহুবিধ কার্য সহজেই সাধিত হইতে পারে। আমাদের কলেজের ছাত্রগণও এই উপলক্ষে তাহাদের দেশ-পরিচর্যা বৃত্তি কার্যে পরিণত করিতে পারেন।"

আমরা বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও কোন শিল্পকুশলী ব্যবসায়ী হইতে পারিলাম না, সে সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন—

"জাপানে অবস্থান কালে দেখিলাম যে ভারতবাসী ছাত্রগণ তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চতর স্থান লাভ করিয়াছে। অথচ কার্যক্ষেত্রে ভারতবাসীর কোন স্থান নাই। জাপানী কিন্তু ঐ অবস্থাতেই সিদ্ধমনোরথ না হইয়া ক্ষান্ত হয় না। সে নিজের নিষ্ফলতার কারণ অন্যের উপর ন্যস্ত করে না। আমাদের দুরবস্থার প্রকৃত কারণ কি? কারণ এই যে চরিত্রে আমাদের বল নাই, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' একথা আমরা মুখেই বলিয়া থাকি। আমি জানি যে আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ স্বদেশী শিল্পের

জন্য সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন। বহু দিনের চেষ্টার পর তাঁহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানাবিধ ব্যবহার্য বস্তু উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তথাপি তাহাদের ব্যবসা যে স্থায়ী হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, এ পর্যন্ত তাঁহারা একজন কর্মকুশল ও কর্তব্যশীল পরিচালক দেখিতে পাইলেন না।

"কেরাণীবাবু শত শত পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের কলমের ও মুখের জোর। বিদেশে দেখিয়াছি, ক্রোড়পতির পুত্রও ব্যবসা শিক্ষার সময় আফিসে সর্বাপেক্ষা নিম্নতম কার্য গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেখানকার সমস্ত কার্য স্বহস্তে করিয়া সম্যক্ শিক্ষালাভ করে। আমাদের দেশে অল্পতেই লোকের মান ক্ষয় হয়।"

আমরা শ্রমের মর্যাদা শিখি নাই, তাই কর্মক্ষেত্রে আমাদের লাঞ্ছনা, দুর্গতি ও পরাজয় পদে পদে। জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন, নিজকে আঘাত করিয়া জাগ্রত রাখিতে হইবে।

"স্বপ্নের দিন চলিয়া গিয়াছে। যদি বাঁচিতে চাও তবে কশাঘাত করিয়া নিজেকে জাগ্রত রাখ।"

আর এক কথা। "যদি ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও, তবে তাহার মানসিক ক্ষমতাকে অপ্রতিহত রাখিতে হইবে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু, তাহা একেবারে আশাহীন ও চিরন্তন।"

জাতির যাহারা মেরুদণ্ড সেই চাষী-মজুরের কথায় বলিয়াছেন—

"সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন করে। সেখানে দেখিতে পাইবে পঙ্কে অর্ধ-নিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্মসার এই পতিত শ্রেণীরাই ধনধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই।

কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চির-বেদনা নিহিত আছে।"

মাতৃভাষার অনুরাগী জগদীশচন্দ্র চিরদিনই। বাল্যকালে বাংলা পাঠশালায় পিতৃদত্ত শিক্ষাব্যবস্থার ফলে বাংলাভাষার উপর তাঁহার একটা স্বাভাবিক অনুরক্তি জন্মিয়াছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমির সহিত মাতৃভাষাও তাঁহার চিত্তে বরণীয় আসন পাইয়াছিল। তিনি তাঁহার গবেষণাগুলি প্রথমে বাংলাভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙালী তাহার মর্যাদা দিতে পারিল কৈ? এমন কি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির নামগুলি পর্যন্ত তিনি সংস্কৃতমূলক স্বদেশী শব্দ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে জগদীশচন্দ্রকে বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল। এই কথা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—

"ইচ্ছা ছিল, কলের নাম ক্রেস্কোগ্রাফ্ না রাখিয়া 'বৃদ্ধিমান' রাখি। কিন্তু হইয়া উঠিল না। আমি প্রথম প্রথম আমার নূতন কলগুলির সংস্কৃত নাম দিয়াছিলাম, যেমন 'কুঞ্চনমান' এবং 'শোষণমান'। স্বদেশী প্রচার করিতে যাইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছে। বলপূর্বক যেন নাম চালাইলাম, কিন্তু ফল হইল অন্যরূপ। গতবারে আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার সময় তথাকার বিখ্যাত অধ্যাপক আমার কল 'কাঞ্চনম্যান' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, শেষে বুঝিলাম 'কুঞ্চনমান' 'কাঞ্চনম্যানে' রূপান্তরিত হইয়াছে।"

জগদীশচন্দ্র দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই সময়ে সাহিত্য-পরিষদের উন্নতি-কল্পে তিনি বহু চেষ্টা করেন। পরিষদের উপর তাঁহার দরদ ছিল। কি চোখে যে পরিষদ্‌কে তিনি দেখিতেন তাহা এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে—

"আমাদের সৃজন-শক্তিরই একটি চেষ্টা বাংলা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষদ্‌কে আমরা

কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না ; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই, এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। অন্তর-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষৎ সাধকের সম্মুখে দেবমন্দির রূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাংলা দেশের মর্মস্থলে স্থাপিত, এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহারস্বরূপ দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।"

১৯১১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে জগদীশচন্দ্র সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন। উপরের উদ্ধৃতিটুকু তাঁহার অভিভাষণের শেষ কথা।

সাহিত্যিক জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি তাঁহার 'অব্যক্ত'। ইহাই তাঁহার একমাত্র বাংলা গ্রন্থ। তাঁহার লেখনী অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ হইলেও, বাংলা ভাষায় তিনি আর কিছু লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। 'অব্যক্ত' কুড়িটি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলির বেশির ভাগই বৈজ্ঞানিক, মাত্র কয়েকটি নিছক সাহিত্য-গুণসম্পন্ন। ইহার মধ্যে 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' প্রবন্ধটি বাংলাসাহিত্যে জগদীশচন্দ্রের এক অনবদ্য সাহিত্যিক সৃষ্টি। তাঁহার প্রেরণাপ্রদ চিঠিপত্রগুলিও বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। জগদীশচন্দ্রের ভাষা প্রাঞ্জল, বলিষ্ঠ ও ওজঃগুণসম্পন্ন।

বিদেশে বৈজ্ঞানিক অভিযান

"বৈজ্ঞানিক সত্যকে অশ্বমেধের যজ্ঞীয় অশ্বের মত শত্রুরাজ্যের মধ্যদিয়া জয়ী করিয়া আনিতে না পারিলে যজ্ঞ সমাধা হয় না।"
—আচার্য জগদীশচন্দ্র

একবার বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া জগদীশচন্দ্র তাঁহার বিদেশ-যাত্রার মর্ম-কথা এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—

"আমি যে সত্য-অন্বেষণ জীবনের সাধনা করিয়াছিলাম, তাহা লইয়া গৌরব করা কর্তব্য মনে করি নাই, তাহাকে জয়ী করাই-আমার লক্ষ্য ছিল। আজিকার দিনে বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরাট রণক্ষেত্র পশ্চিম দেশে প্রসারিত। পূর্বে যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙালীর যেরূপ দুর্ণাম ছিল, বিজ্ঞানক্ষেত্রেও ভারতবাসীদের সেইরূপ নিন্দা ঘোষিত হইত। তাহার বিরুদ্ধে যুঝিতে যাইয়া আমি বারংবার প্রতিহত হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, এ জীবনে ব্যর্থতাই আমার সাধনার পরিণাম হইবে। কিন্তু ঘোরতর নিরাশার মধ্যেও আমি অভিভব স্বীকার করি নাই। তৃতীয় বার পশ্চিম-সমুদ্র পার হইলাম এবং বিধাতার বরে সার্থকতা লাভ করিতে পারিলাম। এই সুদীর্ঘ পরিণামে যদি জয়মাল্য আহরণ করিয়া থাকি, তবে তাহা দেশ-লক্ষ্মীর চরণেই নিবেদন করিতেছি।"

১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় জগদীশচন্দ্র তাঁহার নূতনতর আবিষ্ক্রিয়াগুলি পাশ্চাত্য জগতে প্রচারের জন্য য়ুরোপ যাত্রা করিলেন। য়ুরোপে ইহা তাঁহার তৃতীয় অভিযান। এইবার তিনি ইংলণ্ড হইতে আমেরিকাতেও গিয়াছিলেন। আমেরিকায় জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়া সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল এবং আচার্য সর্বত্র পরম সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

"শুনিয়া সুখী হইবে, এখানে American Association for

Advancement of Science হইতে বিশেষরূপে আহূত হইয়া বক্তৃতা দিতে বাল্টিমোর (Baltimore) গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক স্থলে আমার কলের সাহায্যে নূতন গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। ওয়াশিংটনের Agricultural Dept.-এ (কৃষিবিভাগে) আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেখানে বৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণায় বৎসরে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, এক সহস্র বৈজ্ঞানিক এই কার্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা আমার অনুসন্ধান হইতে অনেক ফল প্রত্যাশা করেন।"

১৯০৯ সালের জুলাই মাসে আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে আসিয়া জগদীশচন্দ্র কতকগুলি সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করেন। উহার মধ্যে Resonant Recorder বা স্বয়ংলেখ যন্ত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহা তৈরী করিয়া বর্তমান অবস্থায় আনিতে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। উহার কথা পূর্বেও একটু বলিয়াছি। এই যন্ত্রের সাহায্যে বৃক্ষের সাড়া লিপিবদ্ধ করা হইয়া থাকে। মানুষকে যেমন উত্তেজিত করা যায়, বৃক্ষকেও সেইরূপ আঘাত দিয়া, চিম্‌টি কাটিয়া, তপ্ত লোহা ছ্যাঁকা দিয়া, আসিডে পোড়াইয়া উত্তেজিত করা যায়। উহাতে গাছের যে পরিবর্তন উপস্থিত হয়, তাহা উক্ত যন্ত্র বলিয়া দেয়। লজ্জাবতী ও বনচাঁড়াল গাছ অতি সহজেই সাড়া দেয়।

ইতিমধ্যে জগদীশচন্দ্র কতকগুলি মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করেন এবং প্রকাশ করেন। উহার ফলে নানা দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার নিকট নিমন্ত্রণ আসে—তাঁহার নূতন আবিষ্ক্রিয়া ও যন্ত্রাদি প্রচারের জন্য। এই নিমিত্ত ১৯১৪ সালে তাঁহাকে চতুর্থ বৈজ্ঞানিক অভিযানে যাত্রা করিতে হইল।

এবার জগদীশচন্দ্র শুধু তাঁহার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি যে নিলেন তাহা নয়, সেই সঙ্গে লজ্জাবতী ও বনচাঁড়াল গাছ কতকগুলি সঙ্গে

লইয়া রওনা হইলেন। তাঁহার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি লইয়া দেশভ্রমণ এক দুরূহ ব্যাপার। অনেক সময় তাঁহাকে উহা নিজেকেই বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইত, এত সন্তর্পণে উহা স্থানান্তরিত করিতে হয়। ইহা বরং সম্ভব। কিন্তু গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের গাছপালা দারুণ শীতের দেশে লইয়া বাঁচাইয়া রাখা এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জগদীশচন্দ্র এই বাঁধাও অতিক্রম করিবার উপায় করিলেন। বিশেষভাবে তৈরী কাচের ঘরের মধ্যে গাছগুলি লইবার ব্যবস্থা করা হইল। যদিও অর্ধেক গাছই পথে মরিয়া গেল, কিন্তু বাকীগুলি লণ্ডনে পৌঁছিয়া গরম ঘরে আরামে বাস করিতে পাইল। বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যের সুবিধার জন্য লণ্ডনে পৌঁছিয়া জগদীশচন্দ্র মৈডা ভেল (Maida Vale) নামক স্থানে একটি নিজস্ব অস্থায়ী পরীক্ষাগার স্থাপন করিলেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, লণ্ডনে রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনের শুক্রবাসরীয় সভায়, রয়েল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্র ক্রমে ক্রমে বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার নবাবিষ্কৃত যন্ত্রসমূহ লোকচক্ষুর সমক্ষে যাহা অস্পষ্ট ছিল, বৃক্ষ-জীবনের সেই সকল গুহ্য কাহিনী ব্যক্ত করিল। লোকে এবার অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক সকলেই জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিতে জড় হইত।

ইহার পর তিনি প্যারি, ভিয়েনা ও জর্মন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাঁহার আবিষ্ক্রিয়াসমূহ প্রচার ও প্রদর্শনের জন্য গমন করিলেন। উদ্ভিদ্‌বিদ্যার গবেষণায় ভিয়েনার রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত বিখ্যাত। ইহার ফিজিওলজিক ইন্‌ষ্টিটিউটের পরিচালক (Director) অধ্যাপক মোলিশ অত্যন্ত আগ্রহে এবং সাদরে জগদীশচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মতিথিতে ইনি এবং আচার্য বসু এক যমজ নারিকেল বৃক্ষ একত্র বপন করিয়াছিলেন— প্রাচী ও প্রতীচীর মিলনের প্রতীক স্বরূপ। এই সময় য়ুরোপীয়

রণাঙ্গনে যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল। যথাসময়ে জগদীশচন্দ্র জার্মানী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমেরিকায় যাত্রা করিলেন।

এবার আমেরিকায় জগদীশচন্দ্রের কিরূপ সমাদর হইয়াছিল তাহা ডাঃ সুধীন্দ্র বসু মহাশয়ের কথা হইতে কিছুটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। সেই সময়ে সুধীন্দ্রবাবু আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"যখন তিনি (জগদীশচন্দ্র) আমেরিকায় ছিলেন, সেই সময়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল স্থান হইতে অনবরত রাশি রাশি চিঠি ও টেলিগ্রাম তাঁহাকে প্লাবিত করিয়া ফেলিত। বিবিধ বিজ্ঞান-সভা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি হইতে বক্তৃতার জন্য এত আহ্বান আসিত যে তিনি যদি প্রত্যহ দুইটি করিয়া বক্তৃতা দিতেন তাহা হইলেও এক বছরের কমে কুলাইয়া উঠিতে পারিতেন না।"

কিন্তু জগদীশচন্দ্র মাত্র কয়েক সপ্তাহ আমেরিকায় ছিলেন। কাজেই শুধু বিশেষ বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থানে বক্তৃতা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার গ্রন্থ ও আবিষ্ক্রিয়া পাঠ্যতালিকায় স্থান লাভ করিয়াছে। যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশচন্দ্রকে তাঁহার স্বীয় পরীক্ষাগারে বিদেশীয় ছাত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

অতঃপর জাপান হইয়া জগদীশচন্দ্র ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন জুন মাস, ১৯১৫ সাল। জাপানের শিল্পবাণিজ্যের অসাধারণ উন্নতি ও প্রসার এবং প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বাণিজ্যের অবনতি জগদীশচন্দ্রকে বড়ই ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। জাপানে তিনি কি দেখিয়াছিলেন, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

ইতিমধ্যে ১৯১১ সালে *দিল্লী দরবার উপলক্ষে ভারত-সরকার* তাঁহাকে *সি-এস্-আই* এবং *কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি-এস্‌সি* উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

১৯১৩ সালে জগদীশচন্দ্রের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার বছর। কিন্তু গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে আরো দুই বছর চাকুরীতে বহাল রাখিলেন। কাজেই ১৯১৫ সালে ৩১ বছর অধ্যাপনার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বিদায় হইলেন। সেই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে সম্মানীয় অবৈতনিক অধ্যাপকরূপে পরিগণিত করিলেন—তিনি কলেজের পরীক্ষাগারে ইচ্ছানুরূপ গবেষণা করিতে পারিবেন।

১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার বিদায়ের পর গভর্নমেণ্টও তাঁহার কার্য পরিচালনার জন্য সাহায্য করিয়াছিলেন। এই বছরই তাঁহার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। সে কথা পরে বলিব।

এই সময়ে তাঁহার সুবিখ্যাত যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফের আবিষ্কার হয়। এই যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"শম্বুকের গতি হইতে গাছের বৃদ্ধিগতি ছয় সহস্র গুণ ক্ষীণ। এজন্য আমাকে নূতন কল আবিষ্কার করিতে হইয়াছে, তাহার নাম ক্রেস্কোগ্রাফ। তাহাদ্বারা বৃদ্ধিমাত্রা কোটী গুণ বাড়াইয়া লিপিবদ্ধ হয়। যেখানে অনুবীক্ষণ পরাস্ত, তাহার পরও ক্রেস্কোগ্রাফের কৃতিত্ব লক্ষ গুণ বেশী। কোটি গুণ বৃদ্ধি আপনারা মনে ধারণা করিতে পারিবেন না, এজন্য গল্পচ্ছলে উদাহরণ দিতেছি। একবার বাংলা-নাগপুর এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের গাড়ীর দৌড় হইয়াছিল, কে আগে যাইতে পারে। এমন সময় এক শম্বুক তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। অমনি সে ক্রেস্কো-গ্রাফের উপর আরোহণ করিল। খানিক পরে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, গাড়ী অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

"বাড়ন্ত গাছ প্রতি সেকেণ্ডে কতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহা এই কল লিখিয়া দেয়। ইহাতে জানা যায় যে, এই গাছটি এক মিনিটে

এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের ৪২ ভাগ করিয়া বাড়িতেছে। গাছটিকে তখন একখানা বেত দিয়া সামান্য রকমে আঘাত করিলাম। এমনি গাছের বৃদ্ধি একেবারে কমিয়া গেল। সে আঘাত ভুলিতে গাছের আধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিয়াছে।”

১৯১৯ সালে তিনি আবার য়ুরোপে গমন করিলেন। এই সময়ে য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহারই জের মিটাইতে সমগ্র য়ুরোপ তখন ব্যস্ত। অনেক ইংলণ্ডীয় বন্ধু-বান্ধব তাঁহাকে এসময়ে ইংলণ্ডে আসিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র কোন আপত্তি শুনিলেন না। ইংলণ্ডে তিনি এবার সাদরে গৃহীত হইলেন। তাঁহার বীক্ষণাগারে দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সমাগত হইত। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে তাঁহার বক্তৃতার অত্যন্ত সমাদর হইল। তিনি নবাবিষ্কৃত ক্রেস্কোগ্রাফ সাহায্যে বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর বিস্ময় উদ্রেক করিলেন। বিলাতের অনেক পত্রিকা ও ইণ্ডিয়া আফিস তাঁহার কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

স্যর মাইকেল স্যাড্‌লার—যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার কমিশনের সভাপতিরূপে কয়েক বছর পূর্বে বাংলাদেশে বেড়াইয়া গিয়াছেন, লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে জগদীশচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন—“ভারতবর্ষের মধ্যশিক্ষা ও উচ্চ-শিক্ষায় আরো বিজ্ঞান-চর্চা চাই। আর চাই ভারতকে অত্যধিক পরীক্ষার কবল হইতে মুক্তি দান। যখন আমরা বাংলাদেশের শিক্ষাকার্যের অনুসন্ধানে প্রেসিডেন্সী কলেজ পর্যবেক্ষণ করিতেছিলাম, সেই সময়ে বুঝিয়াছিলাম জগদীশচন্দ্রের কাজ শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের সম্পদ্‌। জগদীশচন্দ্রের নাম এবং তাঁহার বিজ্ঞান-মন্দির দীপ-বর্তিকার ন্যায় বৈজ্ঞানিকদিগকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে।”

এই সময়ে এবার্ডিনের বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এল্‌-এল্‌-ডি উপাধি প্রদান করেন। অতঃপর ১৯২০ সালের মে মাসে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলোরূপে গৃহীত হন (F. R. S.)। ভারতবর্ষের ইনি দ্বিতীয় এফ্‌-আর-এস্‌। এই বছরই তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

"জগতে ভিক্ষুকের স্থান নাই। কতকাল এই অপমান সহ্য করিবে? তুমি কি চিরকাল ঋণীই থাকিবে? তোমার কি কখনও দিবার শক্তি হইবে না? ভাবিয়া দেখ এক সময়ে দেশ-দেশান্তর হইতে জগতের বহু জাতি তোমার নিকট শিষ্যভাবে আসিয়াছে; তক্ষশীলা, কাঞ্চী ও নালন্দার কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? বিক্রমপুর যে শিক্ষার এক পীঠস্থান ছিল তাহা কি স্মরণ নাই? ভারতের দান ব্যতিরেকে জগতের জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ থাকিবে, সম্প্রতি তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা দেবতার করুণা বলিয়া মানিতে হইবে, এই সৌভাগ্য যে চিরস্থায়ী হয় ইহা কি তোমাদের অভিপ্রেত নহে? তবে কোথায় সেই পরীক্ষাগার, কোথায় সেই শিষ্যবৃন্দ! এই সব আশা কি কেবল স্বপ্নমাত্রই থাকিবে? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, যে চেষ্টার ফলে অসম্ভব সম্ভব হয়, ইহা আমি জীবনে বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অজ্ঞ হিন্দু-রমণী কেবল বিশ্বাসের বলেই বহু দেব-মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। জ্ঞান-মন্দির স্থাপন কি এতই অসম্ভব?"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

"এস বজ্র মহাসনে, মাতৃ-আশীর্ভাষণে,
সকল সাধক এস হে, ধন্য কর এ দেশ হে!
সকল যোগী, সকল ত্যাগী,
এস দুঃসহ দুঃখভাগী,
এস দুর্জয় শক্তি সম্পদ
মুক্তবন্ধ সমাজ হে।
এস জ্ঞানী, এস কর্মী,
নাশ ভারত লাজ হে!"

—রবীন্দ্রনাথ

একবার জগদীশচন্দ্র বড় আক্ষেপ করিয়া বিদেশ হইতে লিখিয়াছিলেন—

"একদিন মনে করিয়াছিলাম যে এমন দিন কবে আসিবে যে দেশ-দেশান্তর হইতে জ্ঞান আহরণের জন্য ভারত-তীর্থে লোক সমাগম হইবে। সেই আশা পূর্ণ হইয়াও হইল না। আমার সমস্ত পুঁজি এদেশে রাখিয়া রিক্তহস্তে ফিরিতে হইবে। কারণ আমার দেশবাসীরা কেবল অতীতের গৌরবে অন্ধ হইয়া আছেন।
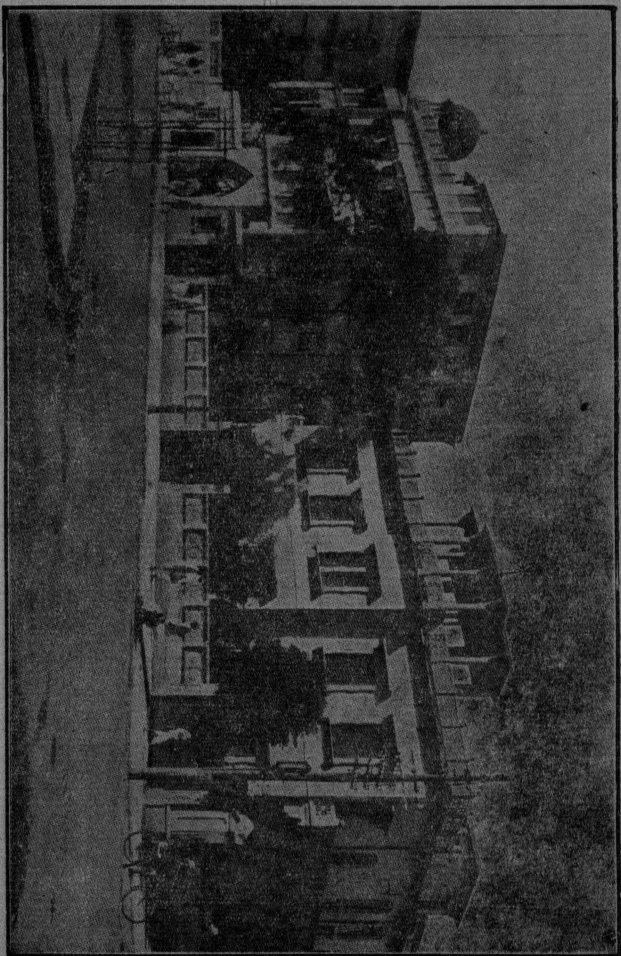
বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

বর্তমানকালে আমাদের যত অধোগমন হউক না কেন, আমরা অতীত কালের কথা স্মরণ করিয়া উৎফুল্ল থাকিব। সেই কথা স্মরণ করিতে আমাদের কি অধিকার?"

বৈজ্ঞানিক জীবনের প্রত্যূষকাল হইতে যে কত স্বপ্ন কত আশা হৃদয়ে আঁকিয়া জগদীশচন্দ্র জীবন-পথে পা বাড়াইয়া ছিলেন। এম্‌নি করিয়া অনেক পূর্বে একদিন বাংলার মাতৃমন্ত্রের প্রথম পুরোহিত ঋষি বঙ্কিম বঙ্গ-ভারতীয় গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—

যেদিন "কত পুরাবৃত্তকার-ঢাকী ঢাক ঘাড়ে করিয়া বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাসি, কাড়ানাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে "কত নাচ গো"—বড় পূজার ধূম বাধিবে। কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লুচি-মণ্ডার লোভে বঙ্গ-পূজায় আসিয়া পাতরা মারিবে, কত দেশ-বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামী দিবে, কত দীন দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে! কত নর্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গাহিবে, কত কোটী ভক্তে ডাকিবে,—মা! মা! মা!!"

গৌরব কীরিট-ধারিণী বঙ্গ-জননীর মূর্ত বিগ্রহের পরিকল্পনা বাঙলার মনীষীরা যুগ যুগ ধরিয়াই হৃদয়ের রত্নাসনে ধারণ করিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রও তাঁহার স্বদেশ-জননীর জগতের সাম্‌নে গৌরব-মণ্ডিত করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের সেই স্বপ্ন ১৯১৭ সালে রূপ পরিগ্রহ করিল। এক পুণ্য তিথিতে কলিকাতা নগরীতে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইল। জাতির মহাজীবনে সে এক শুভদিন। সে দিনের কথা বাঙালীর ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া রহিবে। সেদিন ১৯১৭ সালের ৩০শে নবেম্বর। এই দিন বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবস। কত আবেগ, কত আশা ও আনন্দ লইয়া জগদীশচন্দ্র তাঁহার উদ্বোধন করিলেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ, বন্ধুর যে আবাহন-গীতি রচনা

করিয়াছিলেন, তাহার সেই গুরু-গম্ভীর ঝঙ্কার আজও যেন প্রাণে এক নব চেতনার সঞ্চার করে।

"মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজ বাজহে!
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর, লহ জ্যোতিদীক্ষা,
যাত্রিদল সব সাজহে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে!
বল "জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বী-রাজহে!
জয়হে, জয়হে, জয়হে!"

জগদীশচন্দ্রের 'নিবেদন' মর্মস্পর্শী ভাষায় সমবেত মহামণ্ডলীর চিত্তে অপূর্ব ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল। আবেগময়ী ভাষায় তিনি বলিয়াছিলেন—

"বাইশ বৎসর পূর্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম তাহা এতদিন পরে দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে।

"কি সেই মহাসত্য, যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও আরাধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না; তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যাঁহারা কর্মসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদেরই জন্য।

•"ভারতবাসীরা যে কেবলই ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধান কার্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, কোন সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোন দিনও হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমার কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের নহে।

"বিজ্ঞান অনুশীলনের দুই দিক আছে, প্রথমতঃ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার ; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য ; তাহার পর জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেই জন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতাগৃহ নির্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এস্থানে কোন বহু-চর্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, সেই সকল নূতন সত্য এস্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্বজাতির, সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকা দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে, এবং হয়ত তদ্দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে।

"আমার আরও অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতে জ্ঞান সার্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশীলায় দেশ-দেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহৎরূপে দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে আমাদের কখনই তৃপ্তি

নাই। সর্ব জীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্রপটে বিকশিত কয়িয়াছেন।

"বাইশ শত বৎসর পূর্বে এই ভারত-খণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা রচিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখমোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তিহেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল, যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন, এখন ইহাই আমার সর্বস্ব, ইহাই যেন আমার চবম দানরূপে গৃহীত হয়।

"এই আমলকেব চিহ্ন মন্দিবের গাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকা স্বরূপ সর্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈব অস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থিদ্বাবা নির্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবন দান করেন, তাঁহাদেব অস্থিদ্বারাই বজ্র নির্মিত হয়, যাহার জ্বলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ্য, অর্ধ আমলক মাত্র; কিন্তু পূর্ব-দিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম; কল্য হইতে পুনরায় কর্ম-স্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি; তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নয়, কিন্তু হৃদয়-মন্দিরে। তাঁহার পূজার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক আর কি আকাঙ্ক্ষা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি

হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজয়ের মধ্যদিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।”

বিজ্ঞান-মন্দির সম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শে নির্মিত হইয়াছে। আপার সার্কুলার রোডের উপর ঈষৎ রক্তাভ বেলে পাথরে তৈরী এই অট্টালিকাটি এক গভীর ও পবিত্র ভাব উদ্রেক করে। সমগ্র অট্টালিকায় ভারতীয় আদর্শ ও স্মৃতি যেন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। অপূর্ব ইহার পরিকল্পনা। সম্মুখ ভাগে একটি ছোট বাগান—তাহাতে বিচিত্র লজ্জাবতী, বনচাঁড়াল প্রভৃতি সসাড় গাছপালা। সূর্য ঘড়ি এবং বৃক্ষের সাড়া-জ্ঞাপক একটি যন্ত্র সম্মুখদেশে স্থাপিত। সম্মুখের হলঘরে কাচের আবরণীতে নানা প্রকার যন্ত্রপাতি—আচার্যের আবিষ্কারের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কালের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রাদি যথাক্রমে সজ্জিত রহিয়াছে।

ভারতের গৌরব ও জগতের
কল্যাণ কামনায়
এই বিজ্ঞান মন্দির
দেবচরণে নিবেদন করিলাম
শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ উৎসর্গ-লিপি।

বক্তৃতা-গৃহটি অতি চমৎকার। ভিতরের ছাদটি অজন্তার গুহা-চিত্রের অনুকরণে বিচিত্র। দেয়ালে বাংলার শিল্পিশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের অঙ্কিত রূপক চিত্র বক্তৃতা মঞ্চের উপরে একখানি ধাতু-ফলকে আঁকা রহিয়াছে—‘আলো ও আঁধারের দ্বন্দ্ব—রথে অধিষ্ঠিত সবিতার আবির্ভাবে আঁধারের পরাভব।’

দেয়ালগুলিতে সমস্ত চিত্রাবলী মহাভারতের ঘটনা ও অজন্তার চিত্রাবলী থেকে শিল্পী নন্দলাল প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে চিত্রিত করিয়াছেন—এমন মনোহরণ সুশোভন সে দৃশ্য! হলঘরটি বৈজ্ঞানিক, কবি বা দার্শনিক সকলেরই চিত্তাকর্ষক। এখানে পনের শত লোক ধরে।

বিজ্ঞান-মন্দির ও জগদীশচন্দ্রের বাসভবনের মধ্যবর্তী 'নিবেদিতা-সরঃ' গভীর ভাবদ্যোতক এক অপূর্ব সৃষ্টি। একখানি ব্রোঞ্জ-নির্মিত কারুকার্য-খচিত কাঠামোর মধ্যস্থলে দীপবর্তিকা হস্তে এক মহীয়সী মহিলা দণ্ডায়মানা—সম্মুখে ক্ষুদ্র একটি অর্ধ চক্রাকার জলাশয়ে পদ্ম ও কুমুদ ফুটিয়া অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি ইহাকে এমন আশ্চর্য রূপদান করিয়াছে। নিবেদিতার এই ডিজাইনটিও নন্দলালের আঁকা। নারী—জ্ঞান ও মহান্ আদর্শের প্রতীক—এই ভাবই ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বীক্ষণাগার ও ভিতরের বাগান বড়ই সুন্দর। বাগিচাটি তৃণাবৃত ছোট মাঠ, কুঞ্জ, ঝরণা, ক্ষুদ্র জলাশয়ে পরম রমণীয়। গাছে গাছে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বসানো রহিয়াছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘ সুদৃশ্য বক ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে বড়ই সুন্দর।

জগদীশচন্দ্র তাঁহার আজীবন সঞ্চিত পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। কাশীমবাজারের মহারাজ স্বর্গীয় মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী দুই লক্ষ টাকা, মিঃ এস্. আর. বোমানজী এক লক্ষ টাকা, মিঃ মূলরাজ খাতাও সোয়া দুই লক্ষ টাকা এই প্রতিষ্ঠানে দান করিয়াছেন। ইহাছাড়া অন্যান্য অনেকেই ইহাতে অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন। এই বিজ্ঞান-মন্দির জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি, বাঙালীর জাতীয় গৌরব। আজ ইহা জগতের বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর মহাতীর্থ। আমরা ইহার গর্ব ও গৌরব করি।

জেনেভায় জগদীশচন্দ্র

১৯২৮ সালে জগদীশচন্দ্র জাতিসঙ্ঘের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য জেনেভা যাত্রা করিলেন। এই সময় তিনি ইংলণ্ড এবং য়ুরোপের অন্যান্য সহরও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া আরো উন্নত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

'অক্সফোর্ড ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে ৬ই আগষ্ট জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ডের খ্যাতনামা শরীর-তত্ত্ববিদ্ ও প্রাণি-তত্ত্ববিদ্‌দিগের সম্মুখে তাঁহার নূতন আবিষ্কারসমূহ যন্ত্রসহযোগে প্রদর্শন করেন। তিনি সেখানে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের আভ্যন্তরীণ কলকব্জা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, আহার গ্রহণ ও পরিপাক ইত্যাদির প্রণালী সম্পূর্ণ এক প্রকার। বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভারতবর্ষের ইহা অপূর্ব দান। উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী আচার্য জগদীশের অপূর্ব গবেষণা শুনিয়া ও তাঁহার যন্ত্রের অসাধারণ সূক্ষ্মতা দেখিয়া তাঁহাকে প্রভূত প্রশংসা করেন এবং বেতার সহযোগে এই প্রশংসা-বার্তা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।'

জেনেভাতে যখন উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সভায় জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষিকুলের নিকট যে প্রশংসা পাইয়াছেন, তাহা পৃথিবীর খুব কম বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। তাঁহার যুক্তির সারবত্ত্বা ও তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের অপূর্ব সূক্ষ্মতা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক এলবার্ট আইনষ্টাইন মুগ্ধ হইয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলিয়াছিলেন—জগদীশচন্দ্র যে-সকল অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়াছেন, তাহার যে কোনটির জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।

এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি জগদীশচন্দ্র নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহার খানিকটা বলিতেছি—

“ইংলণ্ডে আমি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও সোসাইটী অব আর্টসের সমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করি। তৎপরে রয়েল সোসাইটী অব মেডিসিন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমি উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদেহে নানাবিধ ঔষধের সমক্রিয়া সম্বন্ধীয় একটি গবেষণামূলক বিষয় ব্যাখ্যান করি।

“গত বৎসর বেলজিয়ামের সম্রাট্ ভারত-ভ্রমণ-কালে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণা-কার্য দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন। তিনি সেই সময়েই আমাকে বেলজিয়ামে প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এবার তাঁহারই উদ্যোগে বেলজিয়ামের ‘ফন্‌দেশিয় ইউনিভারসেতায়ারে’ আমার প্রাণিতত্ত্ব-বিষয়ক একটি ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছিল। বক্তৃতা-সভায় সপারিষদ্ সম্রাট্ ও বেলজিয়ামের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপক-মণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। যাহাতে আমার পরীক্ষা-কার্য সাফল্য-মণ্ডিত হয়, এই জন্য রাজকীয় উদ্যানে পূর্ব হইতেই নানা প্রকার পরীক্ষোপযোগী উদ্ভিদ্ জন্মান হইয়াছিল।

“ল্যাটিন-ভাষা-ভাষী দেশসমূহে আমার আবিষ্কার সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় পাইবার জন্য আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহার ফলে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক-গ্রন্থ-প্রকাশক গথেয়ার ভিলার্স আমার রচিত পুস্তকগুলির ফরাসী সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন।”

“অতঃপর আমি জেনেভার বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া আন্তর্জাতিক বিদ্বজ্জন-সম্মিলনীতে যোগদান করি। এই সময়েই জগৎ-বিজ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের দানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্‌টার ভারত-সচিবকে লিখিয়াছেন যে, আমার ত্রিশবর্ষব্যাপী সাধনার ফল তাঁহাদের সশ্রদ্ধ প্রশংসা অর্জন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, এই

যুগান্তকারী মৌলিক গবেষণাসমূহ তাঁহাদের মনে একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক জগতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্পর্শ আরও ঘনিষ্ঠতর হউক।

"বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের অন্তর্গত আন্তর্জাতিক বিদ্যামন্দিরের পক্ষ হইতে মঁসিয়ে লুসার বলেন যে, সকল প্রকার প্রাণক্রিয়া যে একই ধরণের তাহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইয়াছেন।"

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক-লেখক মিঃ বার্ণার্ড শ' জগদীশচন্দ্রকে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থরাজি উপহার দেন এবং তাহাতে লিখিয়া দেন— From the least to the greatest Biologist। বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী ঔপন্যাসিক রোমাঁ রোলাঁ তাঁহার 'জাঁ ক্রিস্তফাঁ' তাঁহাকে উপহার দিবার সময় লিখিয়া দিলেন—To the Revealer of a New World। ইহা ছাড়া ইংলণ্ডের অন্যান্য সাহিত্যিকগণও তাঁহাকে কম সম্মানিত করেন নাই।

এই অভিযানেও জগদীশচন্দ্র ভিয়েনা গমন করিয়াছিলেন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়ায় এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, উহার রেক্টর মহোদয় ভারত-গভর্নমেণ্টের নিকট প্রশংসাসূচক এক অফিসিয়াল চিঠি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরিবার পথে মিশরে কৃষি-মন্ত্রী নখিয়া পাশার অনুরোধে কায়রোতে গমন করেন। এখানে সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করিতে অনুরুদ্ধ হন। অতঃপর তিনি কায়রোতে বিভিন্ন জাতীয় লোকের সমক্ষে বক্তৃতা দেন। মিশরের বিখ্যাত পত্রিকা 'আল্ মুকত্তাম' তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন এবং এসিয়ার মুখ-উজ্জ্বলকারী গৌরবী বৈজ্ঞানিক বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে পদার্পণ করিলেন।

সপ্ততিতম জন্ম-তিথি

এই বছর ডিসেম্বর মাসে তাঁহার সত্তর বৎসর পূর্ণ হইল। কলিকাতায় এই উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। ১৯২৮ সালের ১লা ডিসেম্বর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্ম-উৎসব সম্পন্ন হয়।

উৎসবের আরম্ভে রবীন্দ্রনাথের "জনগণ-মন-অধিনায়ক জয়হে, ভারত-ভাগ্যবিধাতা" গানটি গীত হয়। তাহার পর এই উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতা পঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

> "জ্যোতিষ্ক সভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
> সেথায় সহস্র দীপ জ্বলে আজি দীপালি উৎসবে।
> আমারো একটী দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
> চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা।"

—(কিয়দংশ উদ্ধৃত)

ইহার পর দেশে-বিদেশের বহু টেলিগ্রাফ ও চিঠিপত্র বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ মহোদয় পাঠ করেন। ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোঁলা মহাশয় আচার্যকে এই বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—

"আমা অপেক্ষা যোগ্যতর লোকেরা আপনার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার মহিমা গান করিবে। আমি ঘোষণা করিতেছি সেই সত্যদ্রষ্টা আপনার মহিমা যিনি বৃক্ষ-ত্বকের ও পাষাণের আবরণে লুক্কায়িত প্রকৃতির মর্মকথা জগৎকে শুনাইয়াছেন। হে সৌম্য যাদুকর, আপনাকে নমস্কার করি।' (ফরাসীর তর্জমা)

চীনের তৎকালীন রাজধানী নাংকিঙের ন্যাশনাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে টেলিগ্রাফ আসিয়াছিল—

"Many happy returns to life devoted to discovering ultimate truth and mystery of life. The world looks to you to lift science into the realm of spiritual reality. All Asia shares in your glory."

তৎপর অনেকগুলি অভিনন্দন পঠিত হয়। স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ হইতে বলেন—"আধুনিক কালে বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে আচার্য বসুই প্রথমে দেখাইয়াছেন, ভারত কেবল দেনাদার নয়, ঋণী নয়, ভিক্ষুক নয়, ভারতের কিছু দেবার আছে। তাঁহার গৌরবে আমরা সকলেই গৌরবান্বিত।"

ইহার পর ভিয়েনার অধ্যাপক মোলিশ, ডাঃ নীলরতন সরকার, বৃহত্তর ভারত-পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার প্রমুখ সকলেই আচার্যকে অভিনন্দিত করিলেন। অভিনন্দনের শেষে জগদীশচন্দ্র ইংরেজীতে উত্তর দিলেন। তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমি গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া যে সংগ্রামে ব্যাপৃত আছি, জ্ঞানের সীমা বিস্তারার্থ জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে কিছু দান করিয়া জাতি-সংঘের মধ্যে তাহার একটি সম্মানিত স্থান অর্জন করিবার জন্য তাহা করিয়াছি। জগৎ আজ যুযুৎসু দুই দলে বিভক্ত; তাহার ফলে সভ্যতার লোপের আশঙ্কা ঘটিয়াছে। জগৎব্যাপী ধ্বংস নিবারণের এক উপায় আছে—তাহা সকল মানবের হিতার্থে মনোরাজ্যে সহযোগিতা। ইহাই প্রাচ্যের বাণী। চীন যে বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিক সত্তার জগতে উন্নীত করিতে বলিয়াছেন, তাহা এই বাণীরই নবতম দ্যোতন। তাহাতে এই সত্যই ঘোষিত হইয়াছে যে, সকলের মধ্যে প্রাণের একত্বের মত সকল মানবের মহৎ অভিলাষ-নিচয়ের একত্ব সম্পাদন করিতে

হইবে—কেবল তাহার দ্বারাই মানব-সভ্যতার ধারাবাহিকতা নিশ্চিতরূপে রক্ষিত হইতে পারে।

"আমার সম্মুখে আমার অনেক প্রাক্তন ছাত্রকে দেখিতেছি, যাঁহারা জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চতম দায়িত্ব ও বিশ্বাস-ভাজনতার পদে অধিষ্ঠিত। তাঁহাদের কৃতিত্ব আমার জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। আমি কেবল তাঁহাদের কথাই বলিতেছি না যাঁহারা যশ ও সাফল্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য অনেকের কথা বলিতেছি যাঁহারা পৌরুষের সহিত জীবনের দুর্বহ ভার মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন এবং যাঁহাদের পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতাময় জীবন অনেকের দুঃখময় জীবনে আনন্দের রশ্মি সঞ্চার করিয়াছে।"

১৯৩১ সালে ১৪ই এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশন আচার্য জগদীশচন্দ্রকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার টাউন হলের গৃহটি সেদিন পত্র-পুষ্প-শোভিত হইয়াছিল এবং সহরের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। কর্পোরেশনের তৎকালীন মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় অভিভাষণটি পাঠ করিলে তাহার উত্তরে জগদীশচন্দ্র বলেন—

"আজ ভারতবর্ষ তাহার বহুমুখী মানসিক শক্তির উৎকর্ষদ্বারা জগতের জাতি-সঙ্ঘে একটি সম্মানিত স্থান অধিকার করিয়াছেন। এক বৃহত্তর শক্তি এই পুণ্যভূমির সন্তানদের অগ্রগতির পথে চালিত করিতেছে, ভবিষ্যতের বৃহত্তর ভারতের গঠনে তাহাদিগকে জ্বলন্ত বিশ্বাসে উৎসাহিত করিতেছে।

"এই নগর গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ আমার কার্য ও সংগ্রামে সহচর হইয়াছে। একদিন এই সহরের এক পথের ধারে একটি আগাছা আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছিল, সেই দিন হইতে আমার জীবনের বর্তমান কাজের ধারাটি চলিয়া আসিয়াছে।

"একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে আমরা পুণ্যভূমি ভারতের অধিবাসী, ইহাই আমাদের গর্ব, ইহাই আমাদের গৌরব। আমরা আজও ভারতবাসী, আমরা চিরদিনই ভারতবাসীই রহিব।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি ও বৈজ্ঞানিক

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, বিজ্ঞান ভাঙে, কাব্য গড়ে। একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। বিজ্ঞানও গড়ে, কাব্যও গড়ে। বৈজ্ঞানিকও স্রষ্টা, কবিও স্রষ্টা। তবে প্রভেদ কোথায় ?

"প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাহাকে সর্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন।"

বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের মিলন ও বন্ধুত্ব বড়ই মধুর। এমন বন্ধুত্ব কমই দেখা যায়। সুখে-সম্পদে, দুঃখে-আঘাতে এই দুইটি প্রাণ নিজেদের সর্বদা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের এই অপূর্ব মিলনের কথা কবীন্দ্র স্বয়ং লিখিয়াছেন—

"তখন বয়স অল্প ছিল। সামনের জীবন ভোর বেলাকার মেঘের মত অস্পষ্ট কিন্তু নানা রঙে রঙীন।

"এমন সময়ে জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। তিনিও তখন চূড়ার উপরে ওঠেন নি। পূর্ব উদয়াচলের ছায়ার দিক্‌টা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীর্তি-সূর্য আপন

সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি। তখনো অনেক বাধা, অনেক সংশয়। কিন্তু নিজের শক্তিস্ফূরণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে আনন্দ সে যেন যৌবনের প্রথম আনন্দের মত আগুনে ভরা, বিঘ্নের পীড়নে দুঃখের তাপে সেই আনন্দকে আরো নিবিড় করে তোলে। প্রবল সুখ-দুঃখের দেবাসুরে মিলে অমৃতের জন্য যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন কর্‌ছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি।

"বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না। তার পরে যখন মধ্যাহ্ন-কাল আসে তখন বিপুল সংসার মানুষকে দাবী করে বসে। তখন কা'র কাছে কি আশা করা যেতে পারে তার মূল্যতালিকা পাকা অক্ষরে ছাপা হয়ে বেরোয়, সেই অনুসারে নিলেম বসে, ভীড় জমে। তখন মানুষের ভাগ্য অনুসারে মাল্য-চন্দন, পূজা-অর্চনা সবই জুট্‌তে পারে; কিন্তু প্রথম যাত্রীর রিক্তপ্রায় হাতের উপর বন্ধুর যে করস্পর্শ নির্জন প্রভাতে দৈবক্রমে এসে পড়ে তার মত মূল্যবান্ আর কিছুই পাওয়া যায় না।"

সেই জীবনের প্রথম বেলাকার বন্ধুত্ব আজীবন একই গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। কর্মজীবনের বন্ধুর পথে এই বন্ধুত্বই মাধুর্য দানে জীবনকে অমৃতময় করিয়া তুলিয়াছে। ছোট বেলাকার সেই কথা স্মরণ করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

"সেই তাঁর (জগদীশের) ধর্মতলার বাসা থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের নির্জন পদ্মাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত বন্ধু-লীলার ছবি। ছেলেবেলা থেকে আমি নিঃসঙ্গ, সমাজের বাইরে পারিবারিক অবরোধের কোণে কোণে আমার দিন কেটেছে। আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে। আমার চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে তিনি আমাকে টেনে বে'র করেছিলেন যেমন ক'রে শরতের শিশির-স্নিগ্ধ সূর্যোদয়ের মহিমা চিরদিন আমাকে শোবার ঘর থেকে ছুটিয়ে বাইরে এনেছে।"

১৯ই নভেম্বর ১৯১৩

বন্ধু—

পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্যে ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল। দেবতার এই বরমাল্য অন্য কি করিয়া তোমার কণ্ঠের শোভা হইত? চিরকাল শক্তিশালী হও, চিরকাল ধর্মযুক্ত হও। ঈশ্বর তোমার চির সহায় হউন।

তোমার
জগদীশ

রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তি-উপলক্ষে

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

প্রিয়করকমলে

বন্ধু

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জনে। কত যুগ যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে
নিবিড় গহন তলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুল ফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
প্রাণের আদিম ভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয়নি ব্যক্ত আন্দোলনে, ইঙ্গিতে, মর্মরে।
তার দিনরজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে
চলেছিল নানা পথে শব্দহীন নিত্য কোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝংকারগীতি; নীরব স্তবনে
সূর্যের বন্দনাগান গাহিয়াছে প্রভাত পবনে।
প্রাণের প্রথম বাণী এই মতো জাগে চারি ভিতে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে,—

কাছে থেকে শুনি নাই;— হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে; অরণ্যের অন্তরবেদনা
শুনেছ একান্তে বসি; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগালো স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্ম মরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্ত্তা নির্ব্বাকের অন্তঃপুর হতে
অন্ধকার পার করি' আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্তমাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্ম্মের সাথে মানব মর্ম্মের আত্মীয়তা;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধক শ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়;—
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি'
সেথা তুমি দীপহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্ত্ত্যের চূড়ায় উড়ে। মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষা কণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,

শুধু শত্রুতার সাথে প্রতিকূল অকারণ রণে
হয়েছে পীড়িত প্রাণ। সে দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের এ কূলে ও কূলে; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্তির মন্দ্র তোমার আপন কর্মমাঝে।
জ্যোতিষ্ক সভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্র দীপ জ্বলে আজি দীপালি উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তব পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা;
তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয়সন্ধ্যাকালে
কবি-হাতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে;
অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি-পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১৪ অগ্রহায়ণ
১৩৩৫

১৮৯৭ সালে জগদীশচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম য়ুরোপ-ভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, সেই সময়ে একদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে আসিলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্রকে বাসায় না পাইয়া, তাঁহার টেবিলের উপর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ গাঁদা ফুলের এক তোড়া রাখিয়া গেলেন। বোধ হয় এই সময়ই জগদীশচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব শুরু হয়।

পদ্মাতীরে শিলাইদাতে যখন রবীন্দ্রনাথ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে জগদীশচন্দ্রও তাঁহার সঙ্গে দুই চারি দিন কাটাইয়া দিতেন—অবশ্য প্রত্যহ একটি করিয়া নূতন গল্প রচনা করিয়া জগদীশচন্দ্রকে শুনাইতে হইত। এই সময়কার স্মৃতি জগদীশচন্দ্র কোন দিন ভুলিতে পারেন নাই। কত সময় সেই কথা স্মরণ করিয়া লিখিতেন—

"আপনাদের স্নিগ্ধ পারিবারিক জীবন, সহরের গোলমাল হইতে দূরে থাকিয়া পুত্রকন্যা পরিবেষ্টিত হইয়া, নীরবে অথচ কর্মঠ ভাবে যেরূপ কাটাইতেছেন, তাহা আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। আর সেই সুন্দর নদী, বালুচর, পল্লীগ্রাম ইত্যাদিতে আমার একরূপ নেশা জন্মিয়াছে।"

এই সময়ের কথা কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের ভাষায় একটু তুলিয়া দিলাম।—

"এই সময়ে পিতার উপর জমিদারি দেখার ভার ছিল। তাঁকে প্রায়ই শিলাইদহ যেতে হত। শীতের সময়ে তিনি পদ্মানদীর বালির চরের ধারে বোট বেঁধে বাস করতেন। তখন তিনি প্রথমে সাধনার পরে ভারতীর সম্পাদনা করছেন। প্রতি মাসেই গল্প বা প্রবন্ধ লিখতে হচ্ছে। পদ্মার দিগন্তব্যাপী বালির চরে খুব নিভৃত কোন স্থানে বোট বাঁধা থাকত। লোকজন সেখানে যেতে পারত না। গল্পের পর গল্প লিখে গেছেন এই পরিবেশে। ছোটো গল্প লেখাতে উৎসাহ দিতেন জগদীশচন্দ্র।

প্রতি সপ্তাহের শেষ শনিবারে তিনি আসতেন। দু'রাত শিলাইদহে কাটিয়ে সোমবার কলেজের কাজে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে যেতেন। আমার পিতার কাছে পৌঁছেই দাবি জানাতেন—গল্প চাই। লেখা শেষ হলেই পড়ে শোনাতে হবে জগদীশচন্দ্রকে, তারপর ছাপতে যাবে। বন্ধুত্বের এই দাবি বন্ধুর পক্ষে অগ্রাহ্য করার উপায় ছিল না।

"আমার পিতা যখন শিলাইদহে বোটে থাকতে যেতেন আমাকে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আমার পিতা যেমন উদ্‌গ্রীব হয়ে জগদীশচন্দ্রের আগমনের প্রতীক্ষা করতেন, আমারও তেমনি ঔৎসুক্য কম ছিল না। আমার সঙ্গে তিনি গল্প করতেন, নানারকম খেলা শেখাতেন, ছোট বলে আমাকে উপেক্ষা করতেন না।

বর্ষার পর নদীর জল নেমে গেলে বালির চরের উপর কচ্ছপ ওঠে ডিম পাড়ত। জগদীশচন্দ্র কচ্ছপের ডিম খেতে ভালবাসতেন। আমাকে শিখিয়ে দিলেন কি করে ডিম খুঁজে বের করা যায়।

পদ্মাচরে বসবাস জগদীশচন্দ্রেরও বড়ো ভালো লাগত। দেশে-বিদেশে কত সুন্দর জায়গা তিনি দেখে এসেছেন। তবু আমাদের বলতেন, পদ্মাচরের মতো এমন সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান পৃথিবীর কোথাও নেই।

জগদীশচন্দ্রের গল্পের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত; তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গীও ছিল ভারি সুন্দর সরল। গল্প বলার মধ্যে যথেষ্ট হাস্যরস থাকত বলে তাঁর গল্প শুনতে বড়ো ভালো লাগত।

জগদীশচন্দ্র গল্প বলে বা তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে আলোচনা করে আমার পিতার আনন্দ বর্ধন করতেন। দিনের বেলাটা এই রকম গল্পগুজবে আলোচনায় কেটে যেত। সন্ধ্যা হলেই উনি কবিকে ধরতেন, লেখা পড়ে শোনাতে হবে। কবিতা প্রবন্ধ কিছুই বাদ দেবার উপায় ছিল না, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের সব

চেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল ছোটো গল্পে। আহারাদির পর শুরু হত গান।"

এই সময়েই জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা দিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আমার বন্ধুর মধ্যে আলো দেখেছিলুম। আমি গর্ব করি যে এই, প্রমাণের পূর্বেই আমার অনুমান সত্য হয়েছিল। প্রত্যক্ষ হিসাব গণনা করে যে শ্রদ্ধা, তাঁর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা সে জাতের ছিল না।"

জগদীশচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব পরম শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বন্ধুকে তিনি একবার লিখিয়াছিলেন—"আমাদের বন্ধুত্ব দেবতার করুণা বলিয়া মনে করি।"

এই বইতে আগাগোড়াই জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ১৩৩৫ সালে জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথ যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহারই খানিকটা তুলিয়া দিলাম—

"তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয় সন্ধ্যাকালে
কবি-হাতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে ;
অপেক্ষা করেনি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।"

জগদীশচন্দ্র সেই দিন তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—

"আমার সমুদয় চেষ্টার মধ্যে আমি কখনও সম্পূর্ণ একাকী ছিলাম না। আমরা যখন উভয়েই অপ্রসিদ্ধ ছিলাম, তখন আমার চিরবন্ধু রবীন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে ছিলেন। সেই সব সংশয়ের দিনেও তাঁহার বিশ্বাস কোন দিন টলে নাই।"

রবীন্দ্রনাথও জগদীশচন্দ্রকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন।

এমন অনেক সময় গিয়াছে যখন সংগ্রামে সংঘর্ষে জগদীশচন্দ্র একেবারে ভাঙিয়া পড়িতেন, সেই সময়ে যদি রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ-বাণী না পাইতেন তাহা হইলে তাঁহার জীবনের অনেক কীর্তিই দেখিতে পাইতাম না।

বিদেশে জগদীশচন্দ্রকে সেই প্রথম জীবনে কবি অভ্যর্থনা পাঠাইয়াছিলেন।—

"বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিত সভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে।
সে ধ্বনি গম্ভীর মন্দ্রে ছায় চারি ধার
হয়ে সিন্ধু পার।
আজি মাতা পাঠাইছে—অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদ খানি
জগৎ সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে ভ্রাতঃ!
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে।"

রবীন্দ্রনাথ 'কথা' কাব্যখানি জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"সত্যরত্ন তুমি দিলে,—পরিবর্তে তার
কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।"

জগদীশচন্দ্রের বিদেশে প্রবাসের সময় রবীন্দ্রনাথ শুধু উৎসাহপূর্ণ চিঠি লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার বিজ্ঞান-সাধনায় যাহাতে অর্থাভাব না হয়, সেজন্য তিনি উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। জগদীশ-চন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন—"তুমি তোমার কর্মের ক্ষতি করিও না,

শ্রীযুক্তা অবলা বসু

যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভার আমি লইব। তুমি অবসাদ হইতে নিজেকে রক্ষা কর।" জগদীশচন্দ্রকে অর্থসাহায্য করিবার জন্য তিনি ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের দ্বারস্থ হন। অর্থ সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথ কাহারো নিকট যাইতে চিরদিনই সংকোচ বোধ করিতেন, এমন কি বিশ্বভারতীর জন্যও। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের জন্য তিনি সকল সংকোচ ত্যাগ করিলেন। তিনি এই সময় লিখিয়াছিলেন, "কেবল জগদীশবাবুর কার্যে আমি মান অপমান অভিমান কিছুই মনে স্থান দিতে পারি না—লোকে আমাকে যাহাই বলুক এবং যতই বাধা পাই না কেন, তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব—ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য নহে, স্বদেশের কার্য। আমি ধনীর পুত্র, কিন্তু ধনী নহি ('দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনাদোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত')—অন্তরে ঈশ্বর যে সকল শুভ সংকল্প প্রেরণ করেন তাহা সাধনের ক্ষমতা আমার হাতে দেন নাই—সুতরাং শুভকর্মের অন্তরায়স্বরূপ সমস্ত অভিমানকে বিসর্জন দেওয়াই আমার কর্তব্য। জগদীশবাবুর জন্য তাহাই দিব।"

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় পরিচালনার প্রথম দিকে পরিহাসবিদ্ধ নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে জগদীশচন্দ্র যে উৎসাহ দিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্লভ ছিল। ১৯০১ সালে ও পরবর্তী বৎসর লণ্ডন হইতে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেন—

"আমরা একদিন আলোর সন্ধান পাইবই, সেই আশায় তোমাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। ··· তুমি যে নূতন বিদ্যাশ্রম খুলিয়াছ তাহাতে সুখী হইলাম।

"তুমি মানুষ প্রস্তুত কর। জীবনে সেই পুরাকালের লক্ষ্য অংকিত করিয়া দাও।

"তুমি যাহার সূত্রপাত করিতেছ তাহাই আমাদের প্রধান কল্যাণ। আমাদের সাম্রাজ্য বাহিরে নয়, অন্তরে।"

১৯০৩ সালে কন্যার গুরুতর অসুখের সময় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন হইতে দূরে থাকায় জগদীশচন্দ্রকে লিখেন—"বিদ্যালয়ের জন্য আমার উদ্বেগের সীমা নাই। ··· কি আর বলিব তুমি মোহিতবাবু ও রমণীকে লইয়া বিদ্যালয়কে দাঁড় করাইয়া দাও। ইহাকে তোমাদের জিনিষ বলিয়াই মনে করিয়ো।" শান্তিনিকেতনের জন্য যেমন রবীন্দ্রনাথ তেমনি জগদীশচন্দ্রও আজীবন ব্যাকুল ছিলেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর যে পরিকল্পনা হয়, তাহাতে জগদীশচন্দ্রেরও দান রহিয়াছে। ১৯০৩ সালেই জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "তোমার স্কুলের কথা সর্বদাই ভাবিতেছি। যতই ভাবি ততই ভবিষ্যতে ইহা হইতে যে এক জাতীয় মহাবিদ্যালয় উৎপন্ন হইবে তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে।" যে কল্পনা বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল, বসু-বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনেও তাহাই সক্রিয় ছিল।

রবীন্দ্রনাথের কেবল কর্মপ্রয়াসে নয়, তাঁহার সাহিত্যিক প্রয়াসেও জগদীশচন্দ্রের প্রেরণা ও প্রচেষ্টা ছিল। "জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অনেক ছোট গল্প রচনায় প্রবৃত্ত করেছেন, কাব্য চয়নিকা প্রকাশে উৎসাহিত করেছেন, নোবেল পুরস্কার লাভের বহু পূর্বেই বিদেশে রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুবাদ প্রচারে চেষ্টিত হয়েছেন; অনুমান করার কারণ আছে যে, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'-রচনার মূলেও জগদীশচন্দ্রের প্রবল প্রেরণা বর্তমান ছিল।" (শ্রীপুলিনবিহারী সেন)।

১৯০০ সালে লণ্ডন হইতে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন—"এখন তোমার বিষয়ে দু-একটি কথা লিখিব। তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে।

আর ভাবিয়া দেখিও, তুমি সার্বভৌমিক।···তোমার কবিতা চিরকালের। তোমার লেখা আমাকে যেরূপ জ্বলন্ত করে, সেরূপ অসংখ্য লোককে করিতে পারে।”

জগদীশচন্দ্রের জীবন-সঙ্গিনীর কথা বড়-কিছু বলি নাই। স্বর্গীয়া অবলা বসু আজীবন আচার্যের সুখ-দুঃখের সমভাগিনী ছিলেন। জগদীশচন্দ্র যত বার বিদেশে গিয়াছেন, প্রত্যেক বারই ইনি তাঁহার সহগমন করিয়াছেন। তাঁহারই সার্বক্ষণিক উৎসাহ ও উপস্থিতি আচার্যের গবেষণা-কার্যে পরম সহায়ক হইয়াছে। তাঁহার প্রথম বার বিলাত গমনের অভিজ্ঞতার কথা খানিকটা বলিয়াছি। এদেশেও সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণের সময় তিনি সর্বত্র জগদীশচন্দ্রের অনুগমন করিয়াছেন।

অবলা বসু মহাশয়া স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের কন্যা ছিলেন।

অবলা বসু মহাশয়া চারি বৎসর ডাক্তারি পড়িয়াছিলেন এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট অনুরক্তি ছিল। দেশের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শিক্ষা ও শিল্পোন্নতি বিষয়ক অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁহারই নির্দেশে পরিচালিত হইত। কলিকাতার বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, সমবায় ভাণ্ডার, জীবন বীমা প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ইহা ছাড়া দেশে এবং বিদেশে জগদীশচন্দ্রের বহু বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী তাঁহার জীবনকে প্রীতির সংস্পর্শে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ‘অনারারী ডিগ্রি’ পাইয়াছিলেন। লীগ অব নেশনস্ এর International Committee of Intellectual Co-operationএর সভ্য ছিলেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য বহু পণ্ডিত-মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল।

জগদীশচন্দ্রের আবাস-বাটীর পারিপার্শ্বিকও তাঁহার কবিচিত্তটি পূর্ণ করিতে কম সাহায্য করে নাই। বিজ্ঞান-মন্দিরের অভ্যন্তরের

গাছপালা-সমাকীর্ণ কুঞ্জ-বিতানের কথা পূর্বে বলিয়াছি। ইহা ছাড়া গ্রীষ্মকালে তাঁহার দার্জিলিং-এর আবাস এবং কলিকাতার ২০ মাইল দক্ষিণে গঙ্গাতীরবর্তী সিজবাড়িয়ায় বাগানবাটী পরম রমণীয় স্থান। দার্জিলিংএ তুষারধবল কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের সম্মুখবর্তী 'মায়াপুরী' নামক বিজ্ঞানবাটিকা বড়ই সুন্দর। সাত হাজার ফিট্ উপরে লোকালয় হইতে দূরে বন-জঙ্গলে ঘেরা ইহার দৃশ্য যেমন গম্ভীর তেমনি মনোরম। সার্থক ইহার 'মায়াপুরী' নাম। লোক-কোলাহলের বাহিরে এই দুইটি স্নিগ্ধ ও নির্জন স্থান জগদীশচন্দ্রের গবেষণায় যেমন সহায়তা করিয়াছিল, তেমনি তাঁহার ভিতরকার কবিটিকেও মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের ভিতরকার এই ধ্যানী কবি ও নৈষ্ঠিক দেশ-প্রেমিকের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার সেই চিঠিগুলিতে যাহা তিনি তাঁহার কবি-বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে চল্লিশ বৎসর পূর্বে লিখিয়াছিলেন। বাইরে থেকে তাঁহার জীবনের এই ভিতরকার সত্যিকার রূপটি ধরা দেয় না।

এই যে চরম সত্য যাহা তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনে দেখা দিয়াছিল, ইহারই পেছনে যুগ-যুগ ধরিয়া মানব-আত্মা ছুটিয়া চলিয়াছে। যতই তাঁহার গবেষণা গভীরতর ও নিবিড়তর হইয়াছে, ততই জগতের ঐক্য-অনুভূতি তাঁহার নিকট ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনেক দিন পূর্বেই কবির চোখে জগদীশচন্দ্রের এই রূপ ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনি সেদিন বলিতে পারিয়াছিলেন—

"ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি
হে আর্য আচার্য জগদীশ!"

জগতের ও জীবনের অন্তর-লোকের ঐক্যদর্শী সত্যদ্রষ্টা জগদীশচন্দ্র সত্যিকারের ঋষি। প্রাচীন ভারতের ঋষিত্বের বিভূতি লইয়া জগদীশচন্দ্র মুমূর্ষু ভারতকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য জগতে এক মহা ঐক্যের বাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এই ঋষির পদরজে এদেশ ধন্য, পৃথিবী ধন্য।

ভগিনী নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্র

আর একটি মহৎ প্রাণের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের মিলন হইয়াছিল। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে জগদীশচন্দ্র ও তাহার সহধর্মিণীর গভীর প্রীতি ছিল। এরূপ নিবিড় আত্মীয়তা বড় দেখা যায় না। ভারতের কল্যাণে নিবেদিতা নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাই তিনি জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাফল্যে ভারতের উন্নতি দর্শনে উৎফুল্ল হইতেন এবং বৈজ্ঞানিককে প্রতিপদে উৎসাহিত করিতেন। ভগিনী নিবেদিতা যথার্থই জগদীশচন্দ্রের প্রেরণাময়ী ভগিনী ছিলেন।

১৮৯৮ সালে ভগিনী নিবেদিতার সহিত জগদীশচন্দ্রের পরিচয় হয়। ইহার পর হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের কর্মে ও জীবনে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিয়াছেন—ভগিনীর মতোই সকল সংগ্রামে জগদীশচন্দ্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এমন কি জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের পাণ্ডুলিপিও অনেক সময় নিবেদিতা স্বহস্তে তৈরি করিয়া দিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের ‘উদ্ভিদের সাড়া’ নামক বিখ্যাত গ্রন্থে নিবেদিতার সহযোগিতার স্বাক্ষর রহিয়াছে। পরবর্তী কালে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, “শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে আমি নিবেদিতার নিবিড় স্নেহের মধ্যে আশ্রয় নিতাম।” রবীন্দ্রনাথ সত্যই লিখিয়াছেন, “জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য।” জগদীশচন্দ্র তাঁহার বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের দ্বারদেশে প্রদীপ হস্তে নারীমূর্তি

এবং শীর্ষভাগে নিবেদিতার প্রিয় প্রতীক ইন্দ্রের বজ্রচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া ভগিনী নিবেদিতার প্রতি প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন।

একবার বিলাতে যাইয়া জগদীশচন্দ্র ও তাঁহার সহধর্মিণী অসুস্থ হইয়া পড়েন। নিবেদিতা তাঁহাদিগকে তাঁহার মায়ের বাড়িতে রাখিয়া শুশ্রূষা করেন এবং সুস্থ করিয়া তোলেন।

রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতা এই তিন জনে বড় ভাব ছিল। প্রত্যেকের জীবনের গতিপথ পৃথক্ হইলেও সকলেই ভারতের গৌরব ও কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং এইখানে তাঁহাদের মধ্যে নিবিড় বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছিল।

১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে জগদীশচন্দ্র, শ্রীমতী অবলা বসু ও ভগিনী নিবেদিতা বুদ্ধগয়া যান। তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ঐতিহাসিক অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, বালক রথীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথের পুত্র) এবং আরো অনেকে। বুদ্ধদেবের বোধিলাভের পূতস্থানে এই মনীষীদের মিলনে এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই ভ্রমণ-প্রসঙ্গে স্যর যদুনাথ লিখিয়াছেন, "সন্ধ্যাকালে আমরা সকলেই বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয়া ধ্যান করিতাম। বুদ্ধদেব যে বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয়া আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, এ বৃক্ষটি তাহারই বংশধর। অল্প কিছু দূরে একখানি গোলাকার প্রস্তরখণ্ড ছিল, তাহার উপরে একটি বজ্র খোদিত ছিল। কথিত আছে, এই বজ্রটি স্বয়ং ইন্দ্র বুদ্ধদেবকে দিয়াছিলেন। এই বজ্রটি দেখিয়া নিবেদিতা বলিলেন, ইহাকে ভারতের জাতীয় চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করা কর্তব্য। আমরা সকলে ইহার অর্থ জানিতে চাহিলে, নিবেদিতা বলিলেন, ইহার অর্থ এই যে, যখন কেহ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য নিজের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করেন, তখন তিনি এই বজ্রের মতই শক্তিশালী হইয়া দেবতাদের নির্দিষ্ট কার্য করেন। এই জন্যই বোধ হয় নিবেদিতা এই

বজ্রচিহ্নকে তাঁহার পুস্তকের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই একই কারণে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের শীর্ষদেশে জগদীশচন্দ্র এই বজ্রচিহ্ন স্থাপন করেন।”

১৯১০ সালের গোড়ার দিকে ভগিনী নিবেদিতা জগদীশচন্দ্র ও লেডি বসুর সঙ্গে অজন্তা গুহার চিত্রাবলী দেখিতে যান। এই সময়ে বিলাতের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লেডি হেরিংহাম অজন্তার ছবি নিতে আসিয়াছিলেন। তাহাকে সাহায্য করার জন্য নিবেদিতা নন্দলাল বসু, অসিত হালদার প্রভৃতি শিল্পীদের পাঠান। জগদীশচন্দ্রের আগমনে শিল্পীরা বিশেষ উৎসাহ লাভ করেন। এই সময়কার কথা শ্রীনন্দলাল বসু পরবর্তী কালে বলিয়াছেন—“অজন্তায় আমাদের কাজ চলছে। জগদীশ বসু, সিষ্টার আর গণেন গুহায় গেলেন দেখতে। সঙ্গে ছিলেন লেডি বসু।

“অজন্তায় আমরা থাকতুম ফর্দাপুর ডাকবাংলায়। টোঙ্গা থেকে ওঁরা নামলেন ওখানেই। সিষ্টার নামলেন ‘দুর্গা’ ‘দুর্গা’ বলতে বলতে ; গলায় তাঁর ছোট রুদ্রাক্ষের মালা। জগদীশচন্দ্র আমাদের আস্তানা দেখে তারপর এলেন গুহায়, আমাদের কাজ দেখতে।

“কাজ চালাচ্ছি আমরা তন্ময় হয়ে। বাইরের জগৎ ঝাপসা হয়ে আসছিল। খাবার সময় বয়ে যেত। এই সব দেখে ওঁরা ভাবলেন, শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

“জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে ছিল মগ বাবুর্চি। সে লেগে গেল রান্না করতে। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিলেন জগদীশ বাবু।”

জগদীশচন্দ্রের কলিকাতা ভবনেই শুধু নিবেদিতার অবাধ গতায়াত ছিল না। তাঁহার দার্জিলিং ভবন ‘মায়াপুরী’তেও নিবেদিতা থাকিতেন। যখন জগদীশচন্দ্র একাকী সংগ্রাম-ক্লান্ত, অবসন্ন ও নিরুৎসাহ হইতেন, সেই সময়ে নিবেদিতার উৎসাহ ও প্রেরণা তাঁহাকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিত। জগদীশচন্দ্রের দার্জিলিংএর

ভবনেই ১৯১১ সালের অক্টোবরে এই মহীয়সী মহিলা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অবলা বসু মহাশয়া ভগিনীর রোগ-শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া সারা ক্ষণ শুশ্রূষা করিতেন। কিন্তু দুরন্ত পাহাড়ী রক্তামাশয় কিছুতেই সারিল না।

প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা করিয়া এই পুণ্যময়ীর পুণ্যদেহ শ্মশানে নেওয়া হয়। জগদীশচন্দ্রও মাঝে মাঝে এই পবিত্রাত্মার শবদেহ বহন করিলেন। শ্মশানে অবলা বসু মহোদয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে নিবেদিতার মস্তক ও হস্ত গঙ্গাজলে ধুইয়া দিলেন, সর্বাঙ্গে গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিলেন। চিতাগ্নি জ্বলিল। জগদীশচন্দ্র ও তাঁহার সহধর্মিণী বন্ধুহারা আত্মীয়হারা হইলেন।

নিবেদিতার মৃত্যুর ছয় বৎসর পরে ১৯১৭ সালের ১০ই নবেম্বর বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী বক্তৃতায় জগদীশচন্দ্র সর্বাগ্রে বলিয়াছিলেন—"আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পিছনে এই মহীয়সী নারীর প্রেরণা ও আন্তরিক সহযোগিতা আমি আজ সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিতেছি। এই বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠায় তাঁহার যে কত উৎসাহ ছিল, তাহা একমাত্র আমিই জানি।"

নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার্থ জগদীশচন্দ্র মৃত্যুর পূর্বে বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনে একটি ব্লক নির্মাণ করাইয়া দেন এবং উহার পরিচালনার জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা দিয়া 'নিবেদিতা ট্রাস্ট' গঠন করিয়া গিয়াছেন।

প্রয়াণ

জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য শেষ জীবনে ভাল ছিল না। শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কয়েক বছর ধরিয়া তিনি গিরিডি যাইতেন। শেষবারও স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় নবেম্বর মাসে তিনি গিরিডি গিয়াছিলেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া কলিকাতায় আসিবেন এবং বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে যোগদান করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অলক্ষ্যে জীবন-দেবতা তাঁহার মহাপ্রয়াণের আয়োজন করিতেছিলেন, সে কথা কে ভাবিয়াছিল? ১৯৩৭ সালের ২৩শে নবেম্বর ৮-১৫ মিনিটের সময় হঠাৎ হৃদস্পন্দন বন্ধ হইয়া আচার্যদেব গিরিডিতেই প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পূর্বদিনও তিনি যথারীতি সন্ধ্যাবেলায় গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইয়া আসিয়াছেন। পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নানের ঘরে গেলেন। কিন্তু সময় চলিয়া গেল, ফিরিলেন না। বসুজায়া দরজা খুলিয়া দেখেন, জগদীশচন্দ্র অচৈতন্য হইয়া বাথরুমে পড়িয়া আছেন। কোন চিকিৎসায় কিছুই হইল না। কলিকাতায় তাঁহার প্রাণহীন দেহ ফিরিয়া আসিল। ভারতীয় বিজ্ঞান-আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া একটি সংগ্রামশীল জীবন নির্বাপিত হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার সংঘর্ষময় জীবন, অগ্নিগর্ভ বাণী ও বিজ্ঞান-নিষ্ঠা মানুষকে চিরকাল অনুপ্রেরিত করিবে।

জন্ম-শতবার্ষিকী

১৯৫৮ সালের ৩০শে নবেম্বর আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হয়। কলিকাতা বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে এবং দেশের নানাস্থানে জগদীশচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রের চিত্রাংকিত ডাকটিকিট প্রকাশ করেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বাল্যকথা ও ছাত্রজীবন

"আমাদের এখন শ্রমশীল হওয়া চাই, অদম্য উৎসাহ চাই, সাহস ও ধৈর্য চাই—মোটের উপর খাটি মানুষ হওয়া চাই। কঠিন সমস্যাসকল মীমাংসা করিবার ভার আমাদের হাতে, আমাদের কি চাকুরীপ্রিয়, দুর্বলচিত্ত, বিলাসী বাবু হওয়া সাজে? শক্ত হ'তে হবে, দৃঢ়ব্রত হ'তে হবে, মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট মানুষ হতে হবে।

"একটি সবল জীবন্ত যুবকসমাজের দরকার হইয়াছে। গণ্ডীছাড়া স্বাধীন শিক্ষা লাভের জন্য উৎসুক, কর্মোৎসাহে চিরনবীন যুবক সম্প্রদায় চাই; তাহারাই এদেশকে নূতন করিয়া গড়িবে, নূতন মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিবে।"—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

খুলনা জেলার রাড়ুলি-কাটিপাড়া নামক একটি ছোট গ্রামে ১৮৬১ সালে শ্রাবণ মাসে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। রাড়ুলি গ্রামখানি কপোতাক্ষ নদের তীরে অবস্থিত। কপোতাক্ষ বাংলার কবির লেখনীতে অমর হইয়া রহিয়াছে। ইহারই তীরবর্তী আর একখানি গ্রাম মাইকেল মধুসূদনের জন্ম-নিকেতন।

প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র রায় উদার-মতাবলম্বী ছিলেন। পারস্য ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন—হাফিজ ও সাদীর অনুপম কবিতা তাঁহাকে অপরিসীম আনন্দ দিত। এদিকে কৃষ্ণনগর কলেজে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক রিচার্ডসন সাহেবের নিকট ইংরাজী সাহিত্যও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নিজের গ্রামে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি নিজ বাসভবনে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেকালের অনেক প্রসিদ্ধ লোকের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, শিশির কুমার ঘোষ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা তাঁহার পিতার স্কুলেই আরম্ভ হয়। পরে এই স্কুলটির পরিচালনার ভার প্রফুল্লচন্দ্র নিজেই লইয়াছিলেন। কিছুদিন গ্রামের স্কুলে পড়িবার পর হরিশ্চন্দ্র ছেলেপেলেদের সুশিক্ষার জন্য কলিকাতায় যাইয়া বাস করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া প্রফুল্লচন্দ্র হেয়ার স্কুলে ভর্তি হইলেন। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করিতেন। প্রায়ই শেষরাত্রে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া লেখাপড়া করিতেন। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও বড় একটা নিয়ম-কানুন মানিতেন না—এই সকল কারণে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। তিনি দুরন্ত আমাশয় রোগে পীড়িত হইয়া পড়েন। ইহার ফলে তিনি স্কুল ছাড়িয়া দেন। তাঁহাকে বাড়ীতেই বসিয়া থাকিতে হয়।

এই সময়ে তিনি বাড়ীতেই বেশ পড়া-শুনা করিতেন। তাঁহার পিতার একটি ভাল লাইব্রেরী ছিল। তাঁহার অনেক বই কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র বাসায় বসিয়া এই বইগুলি পড়িয়া ফেলেন। ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি তাঁহার ঝোঁক আসে। শেষ পর্যন্ত তিনি এই দুই বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। সেই যে তাঁহার ছাত্রজীবন আরম্ভ হইয়াছিল, জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি সেই ছাত্রই রহিয়াছিলেন। শত কর্ম-কোলাহলেও তাঁহার অধ্যয়ন-সাধনার বিরাম ছিল না। এমন অধ্যয়নশীল তপস্বী কমই দেখা যায়। নিজের কথা তিনি লিখিয়াছেন—"জ্ঞানের অনুশীলন আমি ক'রে থাকি। আমি আজীবন ছাত্রভাবে আছি। আমার শৈশব কৈশোর যৌবন কখন চলে গেছে বুঝ্‌তে পারিনি। আজ বার্ধক্যে পা দিয়ে আমি সেই ছাত্রই আছি। আমি দিনের মধ্যে দু'ঘণ্টা নিভৃতে ভাল পুস্তককে সঙ্গী ক'রে কাটিয়ে দি,—দিন সার্থক হয়। জগতে যা কিছু সৎচিন্তা উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা দেয়, তার সবই পুস্তকে নিহিত।"

দুই বছর পরে প্রফুল্লচন্দ্র নিরাময় হইয়া আলবার্ট স্কুলে ভর্তি হইলেন। সেকালে আলবার্ট স্কুলের খ্যাতি ছিল। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের ছোটভাই কৃষ্ণবিহারী সেন 'ইহার রেক্টর ছিলেন। তিনি চমৎকার ইংরেজী পড়াইতেন। এই স্কুলে ব্রাহ্ম শিক্ষকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া প্রফুল্লচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠেন। এই সময়কার কথা তিনি এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন।—

"আমি চির-রুগ্ন। আলবার্ট স্কুলে তখন কেশব সেনের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনতাম। কৃষ্ণবিহারী সেন ছিলেন স্কুলের সর্বময় কর্তা। তিনি ইংরাজী পড়াতেন; তাঁর মত ইংরাজী ভাষার শিক্ষক আজও দুর্লভ। আমি তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলাম। হকারের দোকান থেকে লাটিন ও ফ্রেঞ্চ বই কিনে পড়্তাম। বঙ্গদর্শন আগাগোড়া পড়া যেত।"

এই সময়ে কেশব সেনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছেলেদের উপর অসাধারণ। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় যুবকদল মাতিয়া উঠিত। তাঁহাকে সকলে দেবতার মত ভক্তি করিত। প্রফুল্লচন্দ্রও তাঁহার প্রভাব যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। আলবার্ট স্কুলের ছাত্রজীবনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি আর একদিন বলিয়াছিলেন—

"সেখানে (আলবার্ট স্কুলে) প্রত্যেক শনিবার কেশব সেনের বক্তৃতা হ'ত। তিনি এক সময় বলেছিলেন—বাঙালীর ছেলের লেখাপড়া শেখা যেন বালিশের খোলে তূলো পূরে দেওয়া—কেবল ঠাসো আর গাদো।"

স্বর্গীয় কেশব সেনের এই অমূল্য কথা তিনি বৃদ্ধ বয়সেও ভোলেন নাই। তাই একথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

"তার উপর অভিভাবক সর্বনাশ করছেন—স্কুলের ছুটি হলেই মাষ্টারবাবুকে ছেলের পেছনে লেলিয়ে দেবেন, ছেলে বিদ্বে শিখবে। এরা হচ্ছেন murderer of boys অর্থাৎ বালকহন্তা, কারণ

স্কুলের ছুটির পর অন্ততঃ দুই বা আড়াই ঘণ্টা খেলা চাই। সে সময়টা খোলা মাঠে ছোট, দৌড়াও, লাফাও, নদীতে নৌকা বাও—তবে ত স্বাস্থ্য থাকবে, মনে প্রফুল্লতা আসবে।"

প্রফুল্লচন্দ্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান কলেজে এফ্-এ ক্লাসে ভর্তি হইলেন। এই সময়ে একদিকে যেমন ব্রাহ্ম আন্দোলন দেশে একটা সাড়া আনিয়াছিল, অন্য দিকে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় জাতীয় জীবনের এক নব চেতনার সঞ্চার হইতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ তখন মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। ফরাসী বিপ্লবের কথা উদ্দীপনাময়ী ভাষায় যখন এই তেজস্বী বাগ্মীবরের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইত তখন সকলে রোমাঞ্চিত ও স্তব্ধ হইয়া শুনিত। অমন বাগ্‌বিভূতি পৃথিবীর ইতিহাসে কমই দেখা গিয়াছে। শুধু সুরেন্দ্র-নাথের বক্তৃতা শুনিবার জন্যই প্রফুল্লচন্দ্র মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজে) ভর্তি হইয়াছিলেন।

মেট্রোপলিটান কলেজে পড়িবার সময় প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক স্যর জন ইলিয়ট ও স্যর আলেকজাণ্ডার পেড-লারের নিকট যথাক্রমে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

১৮৮০ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং বি-এ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য-সম্পদ্ কোন দিনই প্রফুল্লচন্দ্রের ছিল না। অথচ রোগা শরীর লইয়াই তিনি পাঠ্যাবস্থা হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কত পড়াশুনা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এই দুর্বল ও রুগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া কি করিয়া এত পড়া-শুনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের ভাষায়ই বলিতেছি—

"কিন্তু পড়তে হবে নিয়মিতরূপে, অর্থাৎ প্রতিদিনকার কর্তব্য-বোধে সময়ের সদ্ব্যবহার করা চাই। ধারাবাহিকরূপে কাজ করা

চাই। বিন্দু বিন্দু বারিপাতে পাথরও ক্ষয় হয়। অধ্যয়ন আমার কাছে সাধনার মত—ধ্যান-ধারণার সমতুল্য! ঠাকুর ঘরে যখন কেউ উপাসনায় নিরত থাকেন, তখন পাছে ধ্যানভঙ্গ হয়, এই ভয়ে কেউ তাঁকে বাধা দিতে যায় না। সেইরূপ কেউ অধ্যয়ন বা চিন্তানিরত থাক্‌লে, তাঁকে কোন মতে বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়।"

প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা তাঁহাকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাংসারিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হওয়াতে এ সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের বিলাতে যাওয়ার এক সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি যখন বি-এ পড়িতেছিলেন, সেই সময়ে 'গিলক্রাইষ্ট স্কলারশিপ' (Gilchrist Scholarship) নামক বৃত্তি লাভ করিলেন। এই বৃত্তির টাকায় তিনি বিলাতে পড়িবার ব্যবস্থা করিলেন। ১৮৮২ সালে তিনি উক্ত বৃত্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেই বছরই বিলাত যাত্রা করিলেন। তখনও তিনি বি-এ পরীক্ষা দেন নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাল্যকাল হইতেই ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু তিনি এডিনবরায় পৌঁছিয়া বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভারতের যথার্থ কল্যাণ সাধন করিতে হইলে এ যুগে বিজ্ঞান-চর্চা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি ব্যতীত অন্য পন্থা নাই। কাজেই এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বি-এস্‌সি ক্লাসে ভর্তি হইলেন। এই সময়ে পি, জি, টেইট ও সি, এ, ব্রাউন নামক দুই জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। প্রফুল্লচন্দ্র এই দুই বৈজ্ঞানিকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া বিজ্ঞান-চর্চায় বিশেষতঃ রসায়ন-শাস্ত্রের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠেন। ১৮৮৫ সালে তিনি বি-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইহার পর দুই বছর পরে রাসায়নিক গবেষণা কার্য করিয়া ডি-এস্‌সি উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার এই

গবেষণা সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তিনি হোপ প্রাইজ (Hope Prize) নামক একটি বিশেষ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এই টাকা পাওয়াতে তিনি আরো ছয় মাস এডিনবরায় থাকিয়া তাঁহার আরব্ধ গবেষণা কার্য আরো কিছুদিন চালাইয়াছিলেন।

এই সময়ে তিনি একটি ব্যাপারে বেশ নাম করিয়াছিলেন। তিনি 'India before and after Mutiny' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। উহাতে সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বের ও পরের ভারতবর্ষের অবস্থার কথা অতি সুন্দর ইংরাজীতে চমৎকার ভাবে লিখিয়াছিলেন। উহাতে একাধারে তাঁহার ভাষাজ্ঞান ও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি অনেকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল।

অধ্যাপনা ও আবিষ্কার

"If I could for a moment command the organ voice of Milton I could exclaim that we are of a Nation not slow and dull, but of a quick, ingenious and piercing spirit, acute to invent, subtle and sinewy to discourse, not beneath the reach of any point the highest the human capacity can soar to." —Sir P. C. Roy.

প্রফুল্লচন্দ্র স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া চাকুরীর জন্য চেষ্টা করেন এবং ১৮৮৯ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই চাকুরী পাইতে তাঁহাকে কম বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় নাই। সে সময়ে বিজ্ঞান-চর্চা ছেলেদের মধ্যে খুবই কম ছিল। বিজ্ঞানের বইগুলি মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাশই সকলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বিজ্ঞান-চর্চায় যথার্থ অনুরক্তি ছিল না বলিলেই চলে। বিজ্ঞানের জন্য জীবন পণ করিয়া সাধনা করা তখনকার দিনে ছেলেদের ধারণায় আসিত না। মৌলিক গবেষণাদ্বারা নব নব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ আবিষ্কারের স্পৃহা যাহাতে ছেলেদের মধ্যে জাগ্রত হয় প্রফুল্লচন্দ্র এই দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। তিনি নিজেও কলেজের লেবরেটারীতে নূতন নূতন গবেষণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিজ্ঞান-চর্চায় বিশেষ প্রতিবন্ধক হইল—কলেজে উপযুক্ত লেবরেটারীর অভাব।

এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাসায় ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিলাতে ছাত্রাবস্থায়ই আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। বসু-পত্নী মহাশয়ের স্নেহে ও যত্নে প্রফুল্লচন্দ্রের একটি বছর বড়ই সুখে কাটিয়াছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র ছেলেদিগকে দরদ দিয়া ভালবাসিতেন এবং তাঁহাদের উন্নতির জন্য সর্বদা উৎসাহিত করিতেন। ছেলেরাও তাঁহাকে তেমনি ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। শুধু কলেজের পাঠ্য বইতেই তাঁহাদের উপদেশ আবদ্ধ থাকিত না। ছেলেরা যাহাতে মানুষ হইয়া কর্ম-জীবনে সাফল্যলাভ করিতে পারে, সে জন্যই তিনি সর্বদা উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন। তিনি কত সময়ে বলিতেন—

"পড়তে হবে পরিপূর্ণ একাগ্রতার সহিত, নইলে কোন কাজ হবে না। বাঙালী ছাত্রের প্রধান শত্রু—পড়বার সময়ে অনেকের একত্র অবস্থান। এরূপ করলে গল্প আসবেই—অন্ততঃ অতর্কিত ভাবে আসবে। আর বাঙালীর প্রধান বিপদ্ হচ্ছে আড্ডা।

"তোমরা অনেকেই য়ুনিভার্সিটির ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হও, সেটা ভাল; কিন্তু আমাদের দেশের অপযশ। কারণ পাশের পর তোমরা হও নষ্ট-স্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়াজীর্ণ, রুগ্ন, ক্লিষ্ট, ক্ষীণদৃষ্টি। কিন্তু এই পাশ না করতে পারলেই আমাদের ছেলেদের মুখ আঁধার। এ অবস্থায় থাকলে চলবে না, এ জীবনের পথ নয়, মৃত্যুর পথ; এপথ থেকে ফিরতেই হবে।"

"মোটকথা এই, যে ছেলে পাঠ্যতালিকাভুক্ত পুস্তকের বাহিরে যত খবর রাখিবে আমি সেই ছেলেকে তত বাহবা দিব। অর্থাৎ যে শিক্ষার দ্বারা স্বাভাবিক প্রতিভার স্ফুরণ হয় ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে ও মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।"

১৮৯৫ সাল প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে এক স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর তাঁহার দীর্ঘ দিবসের গবেষণার ফলস্বরূপ মারকিরাস নাইট্রেট (Mercurous Nitrate) আবিষ্কৃত হইল।

ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। তরলীকৃত (dilute) নাইট্রিক এসিডের (Nitric Acid) সংস্পর্শে পারদের গায়ে হরিদ্রাভ বর্ণের সঞ্চার অনেকেই ইতঃপূর্বে লক্ষ্য করিয়া থাকিলেও

প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন পদার্থসৃষ্টির আভাস দিল। ঠাণ্ডাবস্থায় উক্ত এসিড প্রয়োগে পারদ হইতে তিনি হরিদ্রাবর্ণ মারকিরাস নাইট্রেট্ (Mercurous Nitrate) প্রস্তুত করিলেন। প্রথিতযশা রাসায়নিকমণ্ডলী বাঙালী রাসায়নিকের গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। পারদ-জাত যৌগিক পদার্থ-নিচয়ের একটি শূন্যস্থান পূর্ণ হইল।

১৯১২ সালে লণ্ডনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মহা-সম্মেলন (Congress of the Universities of the Empire) হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং যোগ্যতার সহিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ডার্হাম বিশ্ববিদ্যালয় এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রকে ডি-এস্‌সি উপাধি প্রদান করেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের কার্যকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের রাসায়নিক বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন যথাক্রমে মিঃ পেডলার (পরে স্যার), মিঃ পি মুখার্জি, মিঃ ষ্টেপল্টন ও মিঃ কানিংহাম। ১৯১১ সালে কানিংহাম সাহেবের মৃত্যুর পর আচার্য রায় রাসায়নিক বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের কাজ করিয়াছেন। অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান-চর্চায় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার জন্য ১৯১০ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস (Science Congress) তাঁহাকে সভাপতির পদে বৃত করেন। সেই সভায় তিনি "বর্তমান ভারতে বিজ্ঞানের আবির্ভাব" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

১৯১২ সালে স্যার তারকনাথ পালিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পনের লক্ষ টাকা বিজ্ঞান-চর্চার জন্য দান করেন। পর বৎসর স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ও এই উদ্দেশ্যে দশ লক্ষ টাকা দেন। এই অর্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রফুল্লচন্দ্র এই সময়ে বিলাতে ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রফুল্ল-চন্দ্রকে অনুরোধ জানাইলেন যে, বিজ্ঞান কলেজের পালিত-প্রতিষ্ঠিত রাসায়নিক অধ্যাপকের পদ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। ১৯১৬ সালে গভর্নমেণ্টের অনুমতি-ক্রমে প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পদে নিযুক্ত হন। পর বৎসর তিনি সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তারপর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি এই বিজ্ঞান কলেজে অক্লান্ত ভাবে অধ্যাপনা ও গবেষণা কার্য করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস

"I confess, as a Hindu, the subject of Hindu chemistry has always had a fascination for me."
—Sir P. C. Ray

"আমি যখন হেয়ার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন একবার দুরন্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া এক বৎসর ভুগি। সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে প্রায় দুই বৎসর লাগিয়াছিল। এই দুই বৎসর বাধ্য হইয়া আমাকে বাড়ীতে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এই সময়ে ল্যাটিন, ফরাসী ইত্যাদি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি। বঙ্গদর্শনে রামদাস সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে প্রত্নতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধ লিখিতেন আমি তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। সেই অল্প বয়সে আমার মনে ঐ যে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার প্রতি আগ্রহ হইয়াছিল তাহা বহু কাল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় গুপ্ত থাকিয়া হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস লিখিবার সময় পুনর্বার প্রকাশিত হয়।"

প্রফুল্লচন্দ্রের এই কথা হইতে আমরা জানিতে পারি, তাঁহার অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি বাল্যকাল হইতে সজাগ ছিল। তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এখন তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থ 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসের' (History of Hindu Chemistry) কথা বলিব। ১৯২০ সালে এই বিরাট গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক লেখার প্রেরণা তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন, সে কথা নিজেই বলিয়াছেন—

"পৃথিবীর প্রাচীন জাতিরা রসায়নশাস্ত্রে যত দূর পারদর্শী হইয়াছিলেন তাহা অবগত হইতে আমার চিরকাল কৌতূহল আছে। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে যখন আমি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র

ছিলাম, তখন হইতে টমসন্, কপ্ প্রভৃতি মনীষিগণের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ আমার প্রিয় সঙ্গী ছিল। সেই সময়ে ভারতবাসিগণ রসায়নশাস্ত্রে কিরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য আমার মনে স্বতঃই অনুসন্ধান করিবার স্পৃহা জাগরূক হয়। এই নিমিত্তই আমি 'চরক' 'সুশ্রুত' প্রভৃতি আয়ুর্বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যাহা কালের কবলে অবলুপ্ত হয় নাই, তাহা লইয়া রাসায়নিকের দিক্ হইতে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।"

এই বিরাট কার্যে তিনি যে মনীষীর সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন, তিনিই বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক মঁসিয়ে বার্থেলো। তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া আচার্য লিখিয়াছেন—

"এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে প্রায় একুশ বৎসর পূর্বে আমি মঁসিয়ে বার্থেলোর সংস্রবে আসি। এই ঘটনা আমার ঐতিহাসিক রসায়নশাস্ত্র পাঠের পথনির্দেশক স্বরূপ। যিনি প্রতীচ্য জগতের রসায়নশাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল এবং কোন্ স্থান হইতে তত্রত্য লোকেরা ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল তাহা সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে নির্দেশ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, সেই তৎকালীন রাসায়নিকদিগের অধিনেতা জগদ্বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক, হিন্দুগণ রসায়নশাস্ত্রে কিরূপ উন্নতি করিয়াছিল তাহা জানিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার এই সংকল্পে প্রণোদিত হইয়া আমি 'রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ভারতীয় রসায়নশাস্ত্র বিষয়ক এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রেরণ করি। পরে দেখিতে পাই যে, ঐ গ্রন্থের কোন বিশেষত্ব নাই, কারণ উহাদ্বারা হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের উৎপত্তির হেতু অবগত হওয়া যায় না। বার্থেলো যে ঐ গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার মধ্যযুগে রসায়নশাস্ত্র নামে

তিন খণ্ড বিশাল গ্রন্থ আমাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ প্রধানতঃ আরব ও সিরীয় গ্রন্থাবলী অবলম্বনে লিখিত। আমি কিন্তু তখনও উহাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত অবগত ছিলাম না। উহা অধ্যয়ন করিবার পর হিন্দু রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে একখণ্ড পুস্তক লিখিয়া ঐ গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ করিবার উচ্চ আশা আমার মনে উদিত হয়।"

কিন্তু এই গ্রন্থ লিখা সহজ কার্য ছিল না। বিশেষতঃ ইহার সমুদয় উপাদান হস্তলিখিত কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথিপত্র ব্যতীত আর কোথাও পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল পুঁথিপত্রও একত্র সংগৃহীত ছিল না অথবা কোথায় আছে তাহাও জানা ছিল না। পুরাণ পুঁথি ঘাটিয়া নূতন বই লিখা কত যে পরিশ্রম অধ্যবসায় ও ধৈর্যের আবশ্যক, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। কোথায় মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, কোথায় বারাণসী, কোথায় কাটামুণ্ড, তিব্বত, সকল জায়গা হইতে প্রাচীন পুঁথিসকল আনীত হইল। এইরূপে প্রচুর মালমসলা সংগ্রহ করিয়া সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অক্লান্ত চেষ্টার পর এই বিরাট গ্রন্থ জনসমাজে প্রচারিত হইল। এই গ্রন্থের উপসংহারে আচার্য লিখিয়াছিলেন—

"It is with mingled feelings that I mark the hour of my final deliverance from a self-imposed task which has occupied all my spare time during the last 15 years and more, feelings not unlike those which overpowered the Historian of the Roman Empire.

"The Hindu nation with its glorious past and vast latent potentialities may yet look forward to a still more glorious future, and if the perusal of these lines will have the effect of stimulating my

countrymen to strive for regaining their old position in the intellectual heirarchy of nations, I shall not have laboured in vain."

হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস দুই খণ্ডে বিভক্ত। ইহার প্রথম খণ্ডে রসায়নী বিদ্যা চারি যুগে বিভাগ করা হইয়াছে। প্রথম আয়ুর্বেদিক যুগ—বৌদ্ধপূর্ব যুগ হইতে ৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। চরক, সুশ্রুত, বাগভট্ট প্রভৃতি এই যুগের গ্রন্থ। দ্বিতীয় পরিবর্তন যুগ—৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১০০ খৃষ্টাব্দ; বৃন্দ ও চক্রপাণি এই যুগের গ্রন্থ। তৃতীয় তান্ত্রিক যুগ—১১০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ; রসার্ণব এই যুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। চতুর্থ যুগ—১৩০০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৫০ খৃঃ অব্দ; রসরত্নসমুচ্চয় এই যুগের প্রামাণ্য গ্রন্থ। দ্বিতীয় খণ্ডে অনেক নূতন উপাদান সংযোজিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত রাসায়নিক সিদ্ধ নাগার্জুন ও তৎপ্রণীত 'রসরত্নাকর' ভারতের জ্ঞানবৈভব বর্ধিত করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক পণ্ডিতগণ হিন্দু রসায়নে যে অসাধারণ উন্নতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। এমন কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও হিন্দু রাসায়নিক গোবিন্দাচার্য 'রসসার' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে হিন্দুগণ রসায়ন-শাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং উহা এই দেশের মাটীতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক মঁসিয়ে বার্থেলো এবং প্রাচ্য-বিদ্যাবিদ্ সিলভাঁ লেভি এই গ্রন্থের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন।

হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড ১৯০৫ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয় এবং ইহার দুই বছর পরে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

নব্য বাঙ্‌লার রাসায়নিক গোষ্ঠী

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সবচেয়ে বড় দান ও কৃতিত্ব বাংলা দেশে তাঁহারই শিক্ষা-দীক্ষায় একদল নব্য রাসায়নিকের সৃষ্টি। বস্তুতঃ আচার্যদেবের আর কোন কৃতিত্ব না-ও যদি থাকিত, তবু শুধু এই একটি মাত্র কীর্তি-গৌরবে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিত। আচার্যদেবের ছাত্রগণ যথার্থই তাঁহার সাধনার উত্তরাধিকারী—তাঁহাদের অনেকের কৃতিত্ব আচার্যকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। দেশ-বিদেশে প্রফুল্লচন্দ্রের খ্যাতি তাঁহার ছাত্রদের কৃতিত্বের জন্যই শত গুণ বর্ধিত হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার প্রথম অবস্থায়ই চাহিয়াছিলেন, একদল যথার্থ অনুসন্ধিৎসু ছাত্র যাঁহারা বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় জীবন পাত করিবেন। ইহার জন্য দীর্ঘদিন তিনি প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে ১৯১০ সাল হইতেই তাঁহার এই আশা সার্থক হইতে চলিল। এই সময়েই জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত প্রমুখ ছাত্রগণ আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের 'নির্জন লেবরেটরী মুখরিত করিয়া তুলিল।' তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে ডাঃ রসিকলাল দত্ত, ডাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি, ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন, অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ সেন, স্বর্গীয় অধ্যাপক অতুলচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী ও মাণিকলাল দে, ডাঃ জ্ঞান রায়, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, ডাঃ পুলিন সরকার, ডাঃ প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ খ্যাতি ও যশ অর্জন করিয়াছেন। ডাঃ রসিকলাল দত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নী বিদ্যায় সর্বপ্রথম ডি-এস্‌সি উপাধি

লাভ করেন। যখন ইনি পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন, তখনই আচার্য রায় তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে গবেষণা কার্যে বিশেষভাবে নিয়োজিত করেন। আচার্য রায়ের বহু আবিষ্ক্রিয়া ও গবেষণা তাঁহার ছাত্রদের সহযোগে সম্পন্ন হইয়াছে।

তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে ডাঃ নীলরতন ধর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ রসায়নশাস্ত্রের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন; ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ, পরে বাঙ্গালোর সায়েন্স ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যক্ষ, খড়্গপুর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের অধ্যক্ষ ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন। ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জি, ডাঃ পুলিন সরকার, ডাঃ প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রমুখ অধ্যাপকগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজের অধ্যাপক, ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন রাঁচি লাক্ষা ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টার নিযুক্ত হন। ইনিই এই পদে সর্বপ্রথম ভারতীয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

"ব্যবসা কর, শিল্প ধর, চাকরীর মায়া ছাড়"

"আজ এই ভীষণ অন্নসমস্যার দিনে আমাদের যুবকগণ কি শুধু পাশ-ফেল গণনা করে জীবনের শ্রেষ্ঠতম ভাগ নষ্ট করে ফেলিবেন? চাকুরী হ'ল না বলে জগৎ অন্ধকার দেখবেন? এ মোহ ছাড়িয়ে উঠ্‌তেই হবে। আমাদের এখন একটা সবল জীবন্ত যুবক-সমাজের দরকার হয়েছে, যারা গতানুগতিকের গণ্ডী ভেঙে অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে একটুও ভয় পাবেন না, পাশ-ফেলের হিসাব না রেখে যাঁরা আপনার তেজে আপনি দীপ্ত হ'য়ে প্রচণ্ড কর্ম-চেষ্টা প্রকট করে দেখাবেন।"

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

প্রফুল্লচন্দ্র যেমন এক দিকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ আবিষ্কার করিয়া জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন, অন্য দিকে বিজ্ঞানকে কার্যকরী করিয়া দেশের আর্থিক উন্নতির সহায়তা করিয়াছেন। এ বিষয়ে বেঙ্গল কেমিক্যাল তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিস্তম্ভ। বাঙালীর আর্থিক দুরবস্থা ও উহার প্রতীকারের জন্য আচার্য রায় কত না বক্তৃতা করিয়াছেন, কত না প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তও তাঁহার ইহাতে বিরাম ছিল না।

পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে চাকুরী করিয়া ২৫০৲ টাকা পান। উহা হইতে মাসে মাসে তাঁহার পৈতৃক ঋণ শোধ করেন, উদ্বৃত্ত সামান্যই থাকে। এইরূপে ৮০০৲ টাকা সঞ্চিত হইল। এই সামান্য পুঁজি সম্বল করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতা অপার সার্কুলার রোডের এক ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরে অধুনা-বিখ্যাত বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার কথা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

"The Bengal Chemical and Pharmaceutical Works had its birth and early struggles in the dark

and dingy rooms of a house in Upper Circular Road, and it started with the modest sum of Rs. 800."

প্রথম অবস্থায় বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্য প্রফুল্লচন্দ্রকে 'কুলির মত' খাটিতে হইত। কত অনটন ও দুর্ভাবনার মধ্য দিয়া ইহার শৈশবকাল কাটিয়াছে। আচার্য রায় লিখিয়াছেন—

"আমার প্রিয় বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের বর্তমান মূলধন প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। ৩০ বৎসর পূর্বে উহা মাত্র ৮০০৲ টাকা লইয়া আরম্ভ করি। একদিন আমার ছোট ভাইর উপর চিনি কিনিবার ভার দিই। সে শ্যামবাজারের এক ডাক্তারখানার বিলের টাকা হইতে বড়বাজারে গিয়া চিনি সওদা করিবে, তবে আমি সিরাপ প্রস্তুত কবিব। ট্রামের ভাড়া ৪ পয়সা জুটিল, এক পয়সা জুটিল না। তখন এমনই অভাবে দিন গিয়াছে। আর এখন?"

আবার বলিয়াছেন—

"তখন সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হ'ত, নিজেদের সুখ ও স্বাস্থ্যের দিকে একটুও নজর দেবার অবকাশ ছিল না। আর আমাদের সময় কারও কাছ থেকে কোন রকম উৎসাহ পাবার সুবিধা ছিল না,—বিজ্ঞানের গবেষণার জন্যে কেউ কখনও উৎসাহ দিত না। এখন অনেক পরিবর্তন ঘটেচে—এ-বছর আমাদের কারখানার একজন বৈজ্ঞানিক এক লাখ টাকা কেবল রয়েলটি হিসাবে পেয়েছেন। তিনি আগুন নেবাবার একটা যন্ত্র (Fire Extinguisher) নতুন ভাবে তৈরী করেছেন, এই Fire King গভর্নমেণ্ট বেশী পরিমাণে নেওয়াতে আমরা তাঁকে এক লাখ টাকা পুরস্কার দিয়ে তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান রাখতে পেরেছি।"

সেই দুঃসময়ে যাঁহারা বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রথম অবস্থায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। বস্তুতঃ তাঁহাদের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও সাহায্য না পাইলে বেঙ্গল কেমিক্যাল আজ এই উন্নতি

লাভ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। এই সকল নীরব কর্মীর মধ্যে ডাঃ অমূল্যচরণ বসুই সর্বপ্রথম প্রফুল্লচন্দ্রের সাহায্যে নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাহার পর সতীশচন্দ্র সিংহ নামক একজন যুবক এম্-এ পাশ করিয়া ইহাতে যোগদান করেন। ইনি বস্তুতঃই বিজ্ঞান-যজ্ঞে আত্মোৎসর্গ করেন। একদিন হাইড্রোসায়েনিক এসিড্ (প্রুসিক এসিড্) লইয়া কার্য করিবার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী প্রেসিডেন্সী কলেজে ডিমনষ্ট্রেটার ছিলেন, তিনিও আসিয়া ইহাতে যোগ দিলেন। তাঁহার মত একনিষ্ঠ ও নীরব কর্মী খুব কমই দেখা যায়।

আমাদের একটা জাতীয় কলঙ্ক আমাদের চাকুরী-প্রিয়তা। ইহার ফলে বাঙ্লার ব্যবসা-বাণিজ্য আজ পরের হাতে। বাঙ্লার কোটি কোটি টাকা আজ শোষণ করিয়া লইতেছে ইংরাজ, আর্মেনিয়ান, ভাটিয়া ও মাড়োয়ারী বণিকের দল আর আমরা হা অন্ন, হা অন্ন বলিয়া ক্ষুধার জ্বালায় ছুটাছুটি করিতেছি।

প্রফুল্লচন্দ্র এই দৈন্য দূর করিয়া আবার এই শ্যামলা বাংলাকে সোনার বাংলায় পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল ছাড়া তিনি আরো ৫।৭টি যৌথ করিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কতবার বলিয়াছেন—

"ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রধান জিনিষ প্রবল আগ্রহ ও চেষ্টা, কোন অসুবিধাতেই দমে না যাওয়া এবং অল্প বেতনে বা বিনা বেতনে কোন চল্‌তি কারবারে শিক্ষানবিশী করা। এমন যুবক নেই যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'লে কৃতকার্য হ'তে না পারেন। এখন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।'

"আমাদের দেশের লোক শ্রমের মর্যাদা বুঝেন না। এই জ্ঞানটা আমাদের বড় কম। 'পরিশ্রম করলেই ছোট লোক হ'ল' এরূপ একটা ধারণা আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'য়ে আছে। আজি

সেই যুবকটিকে ধন্যবাদ দিই যিনি বলেন কুলিগিরি করব; এঁর বাহাদুরী আছে। 'বসে খাব বা কারও স্কন্ধে চেপে খাব'—এ বড় লজ্জার কথা—বড় জঘন্য কথা। যে অলস, যে পরভাগ্যোপজীবী তাঁর বেঁচে থাকবার অর্থ নেই।

"আমাদের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে টাকার অভাব। কোন সভা-সমিতিতে ভলান্টিয়ারের অভাব হয় না—কিন্তু যথার্থ কষ্ট স্বীকার করে যে কাজ করতে হয়, সেই খানেই আমরা লোকাভাব দেখি। আমাদের উৎসাহ খড়ের আগুনের মত দপ্ করে জ্বলে উঠে, কিন্তু আবার খপ্ ক'রে নিবে যায়। এরূপ ভাবোচ্ছ্বাস কর্মপঙ্গুত্ব আনয়ন করে। ভাবপ্রবণ হও, খুব বড় কল্পনা কর, ভাবুকতার বলে গতানুগতিকের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেল, নূতন পথে এগিয়ে চল। অলসতা ও সুখপ্রবণতাই হচ্ছে আমাদের স্বাতীয় দুর্বলতা। এখন আমাদের আত্মবিশ্বাস চাই, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস চাই, আমাদের প্রতি বিশ্বাসের উপযুক্ত হওয়া চাই।

"মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট মানুষ হতে হবে। অন্নসমস্যার মীমাংসা কর্‌তে পার্‌লে সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া আমার অন্য কিছু বল্‌বার নাই। এসব কাজে আমাদের স্পৃহা নেই, প্রবৃত্তি নেই। এই প্রবৃত্তি আগে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে, এই স্পৃহা মনে তীব্র হ'লে নূতন পথে চল্‌বার সাহস হবে।

"তারপর বাঙালী কখনও অংশীদারীতে কাজ করতে পারে না। বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে, যদি সে অংশীদার নিয়ে কাজ আরম্ভ করে তবে অনেক সময় হিতে বিপরীত হ'য়ে দাঁড়ায়—কাজ শিখে নিয়ে অংশীদার পালায়। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাবে যৌথ কারবারেও বাঙালীর চেষ্টা সফল হয় না। এটা হচ্ছে আমাদের জাতীয় দোষ।

"আমাদের অনেকে প্রথম উদ্যমে ব্যবসায়ে প্রবেশ ক'রে অল্প দিনের মধ্যে সফলতা লাভের জন্য অধীর হ'য়ে উঠেন। আর

যদি প্রথমে কিছু লোকসান হয় ত অমনি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে 'হা চাকরী, হা চাকরী' ক'রে বেড়ান। কিন্তু স্থিরভাবে লেগে থাক্‌তে না পার্‌লে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সফলতা লাভের আশা দুরাশা মাত্র। তাঁরা বোঝেন না যে লোকসান দিয়ে তাঁরা বরং দক্ষ হ'লেন। আসল মাঝি সেই, যে পদ্মা পার হয়েছে, মাথার উপর দিয়ে যার অনেক ঝড়ঝাপ্টা গেছে। ঝড়ঝাপ্টা না পোহালে কোন কাজই হয় না। হতাশ হওয়া একেবারেই ঠিক নয়। তোমরা হতাশ হয়ো না -তা' হলেই লোকসান যাকে বল্‌ছ তার মধ্যে লাভ দেখ্‌তে পাবে। পাঁচ বার ধাক্কা খেয়ে তবে শিক্ষা লাভ হয়।"

বাঙালী যুবকদের এই কর্তব্য নির্দেশ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

"এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে আমাদের যুবকগণ বসিয়া থাকিলে অথবা নির্জীব ভাবে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ-ফেল গণনা করিলে চলিবে না। দেশে ছোট-বড় অনেক চাকুরে লোক আছে তাহাদের বংশ-বৃদ্ধি করা কখনও যুবকদের জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। এ আশা, এ মায়া ত্যাগ করিতেই হইবে।

"যুবকগণ গৃহের শত দৈন্য প্রভৃতিতে অকালে ভারাক্রান্ত হয়ে উদ্যম-শক্তি হারিয়ে ফেলে। স্যাড্‌লার বলেছেন যে তিনি বাঙালী যুবককে হাস্‌তে দেখেন নাই। আশ্চর্য হবার কথা নয়।"

কয়েক বছর পরে বেঙ্গল কেমিক্যালকে লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করা হয়। সেই সময়ে স্যার রাসবিহারী ঘোষ, ডাঃ চুণীলাল বসু প্রভৃতি এই কারবারে পরিচালকরূপে যোগদান করেন। তখন কোম্পানীর মূলধন করা হয় পাঁচ লক্ষ টাকা। এখন ইহার মূলধন পঁচিশ লাখের উপর। এখন বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রকাণ্ড কারখানা মাণিকতলায় ১১ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। এই কারখানায় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, পানিহাটিতে ১৯১৯-২১ সালে ১৫০ বিঘা জমির উপর নূতন কারখানা খোলা হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল বাঙালীর সংহত প্রচেষ্টার কীর্তিস্তম্ভ। ইহার পরিচালনা সম্পূর্ণ বাঙালীরাই করিয়া থাকেন। ইহার কারখানার ভূতপূর্ব ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রেও সুপ্রসিদ্ধ। তিনি আচার্য রায়ের প্রাক্তন ছাত্র। 'পরশুরাম' ছদ্মনামে তিনি যে অপূর্ব হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে তাহা অপূর্ব দান। বেঙ্গল কেমিক্যালের সুন্দর সুন্দর নামের পরিকল্পনা ইনিই করিতেন। ইহার অন্যতম পরিচালক শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাত্মাজীর আহ্বানে খদ্দর ও কুটীর-শিল্প প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এখানে রাসায়নিক গবেষণা কার্যে একদল বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত আছেন—তাঁহারা প্রত্যেকেই বি. এস্-সি বা এম্. এস্-সি বা ডক্টরেট উপাধি-প্রাপ্ত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বেঙ্গল কেমিক্যাল ভারত গভর্নমেণ্টকে যুদ্ধের নানা প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করেন। এই সাহায্যের জন্য এবং বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার জন্য গভর্নমেণ্ট প্রফুল্লচন্দ্রকে 'স্যর' উপাধি প্রদান করেন। এই দুই কারখানায় প্রতিদিন ২০ টন করিয়া সালফিউরিক এ্যাসিড্ তৈরী হয়। আলকাতরা ডিষ্টিলেসন্ বিভাগে ন্যাপথলিন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পানিহাটি কারখানায় হীরাকস, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, সোডিয়ম, ডাইক্রোনেট, জিঙ্ক ক্লোরাইড্, ইথর প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। দৈনিক ৩০ টন অ্যালাম তৈরির একটি বিরাট প্ল্যাণ্ট পানিহাটিতে আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় সিরাম, ভ্যাকসিন্ ও ইনজেকশন্ দিবার বিবিধ ঔষধপত্র মাণিকতলা কারখানায় তৈরি হয়। প্রত্যেক বিভাগেই অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বৈজ্ঞানিকগণ কার্য পরিচালনা করেন। এখানের রিসার্চ লেবরে-টরীতে গবেষণা করিয়া শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস ও শ্রীসতীন্দ্রজীবন দাশগুপ্ত প্রভৃতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট্ উপাধি লাভ করেন। ২৫ বছরে বেঙ্গল কেমিক্যালের মাল বিক্রয় বার্ষিক ২৩ লক্ষ টাকা হইতে দেড় কোটি টাকায় উন্নীত হইয়াছে। বর্তমানে ৪০০০ লোক বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানায় কাজ করে।

জনহিত ও সমাজ-সেবা

'হিন্দুধর্ম দেশাচারে লোকাচারে পরিণত। ধর্ম এখন আশ্রয় নিয়েছেন—জলের কলসী ও ভাতের হাঁড়ির ভিতর।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

"জাতির সমস্ত বিদ্যা, যশ, ক্ষমতা আত্মসাৎ করে নিজে বাড়বে? শরীরকে অনশনে রেখে মস্তিষ্ক বড় হবে? তা কি সয়? সয় না? তাই কি অধঃপতন।"

ডি. এল্. রায়

"India must wake up, shake off her degradation; put life and heart into every class of her people. elevate her women and depressed classes and remove the galling restrictions of cast and all social inequalities.'

—Sir P. C. Roy

প্রফুল্লচন্দ্রের ছিল কর্ম-বহুল জীবন, তাঁহার কাজের অন্ত ছিল না। এই ক্ষীণ দেহ-যষ্টি লইয়া তিনি নানা কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকিতেন। দেশের এমন বৃহৎ জনহিতকর ব্যাপার ছিল না যাহার সঙ্গে তিনি সংলিপ্ত না ছিলেন।

১৯২১ সালে খুলনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, অর্থাভাবে অন্নাভাবে দলে দলে লোক মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সরকার তদন্ত করিতে পাঠাইলেন। সরকার পক্ষ থেকে রিপোর্ট বাহির হইল—খুলনায় দুর্ভিক্ষ হয় নাই; এখনও সেখানে গরুর দুধ পাওয়া যায়, লোকের ঘাসপাতা খাইতে হয় না। কিন্তু খুলনাবাসী প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট সে স্থানের শোচনীয় অন্ন-কষ্টের কাহিনী প্রত্যহ আসিতে লাগিল। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। 'রিলিফ কমিটি' করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর জন্য চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি টাকা তুলিয়া নিরন্ন দেশবাসীর সহায়তা করিলেন।

এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন দেশময় প্রবল বেগে চলিতেছে। চরকা ও খদ্দরের বাণী ভারতের

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে। আচার্য রায়ের চরকা ও খদ্দরে তখন কোন আস্থা ছিল না। কিন্তু খুলনার দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কমিলে, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের কি কাজ দেওয়া যায়, তাহা চিন্তা করিতে করিতে চরকা ও খদ্দরের কথা তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারী অবসর সময়ে চরকার সুতা কাটিলে ও কাপড় বুনিলে, তাহাদের অনেক সাহায্য হইবে। ইহাই স্থির করিয়া তিনি ঘরে ঘরে চরকা বিতরণ করিলেন। তাঁহার অদম্য চেষ্টা ও উৎসাহে খুলনায় এই মৃত শিল্পটি যেন প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া উঠিল। দিন রাত সে চরকার ঘর্-ঘরানিতে মনে পড়ে—

"ভোমরায় গান্ গায় চরকায়, শোন্ ভাই।
খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই।
ঘর-বার কর্‌বার দর্‌কার নেই আর,
মন দাও চর্‌কায় আপ্‌নার আপ্‌নার।
চর্‌কার ঘর্ঘর পড়্‌শীর ঘর ঘর।
ঘর ঘর ক্ষীর সর,—আপনায় নির্ভর।"

ইহার পর ১৯২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গে ভীষণ বন্যা হয়। রাজসাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামগুলি একেবারে ভাসিয়া যায়। লোকের ঘর-বাড়ী, গরু-বাছুর, শস্য সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। লোকে হাহাকার করিতে লাগিল। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, এই বন্যায় ১৮০০ বর্গ মাইল জায়গা ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহাতে ৪০।৫০ জন লোক মারা যায়, ১২ হাজার গরু বন্যায় ভাসিয়া যায়। দেশবাসীর এই দারুণ দুরবস্থায় প্রফুল্লচন্দ্র কি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? তাঁহারই উদ্যোগে বন্যা নিবারণের জন্য 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' গঠিত হইল। সমগ্র বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ হইতে চাঁদা তোলা হইল। ধনী, গরীব, কুলি-মজুর সকলেই সাধ্যানুসারে সাহায্য করিল। এইরূপে প্রায় সাত লক্ষ

টাকা উঠিল। আচার্যের অধিনেতৃত্বে বাংলার যুবকগণ দলে দলে এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিল। বন্যাপীড়িত অঞ্চলে নানাস্থানে কেন্দ্র করিয়া লোকদের চাউল, জামা-কাপড় ও অর্থ সাহায্য করা হইল। তারপর যখন জল কমিয়া গেল, তখন রোগ দেখা দিল। ডাক্তার ও ঔষধপত্রাদি লইয়া যুবকদল অগ্রসর হইল। চিকিৎসার ব্যবস্থাও হইল, কিন্তু এই সব লোকেদের কাজ কি দেওয়া যায়? এবারও চরকা বিতরণ করা হইল। লোকেও উৎসাহে সূতা কাটিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাদের কাটা সূতায় তৈরী খদ্দর বাজারে খ্যাতি লাভ করিল।

হিন্দুসমাজের আজ নানা বিপদ, অনেক সমস্যা। যে সকল ব্যাধি এই সমাজে পুষ্ট হইতেছে, তাহা দূর করিতে হইবে। তবেই হিন্দুসমাজ নিরাময় ও শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইবে। নচেৎ এই দুর্বল ও পঙ্গু সমাজদের লইয়া জগতে টিকিয়া থাকা আজকার দিনে আর চলিবে না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এদিকেও দৃষ্টি দিয়াছেন। কত বক্তৃতায়, লেখায়, পুস্তিকায় তিনি এই সকল বিষয়ে সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কারের এই প্রচেষ্টার জন্য তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্রই খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ১৯১৮ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে তিনি বলিয়াছিলেন—

"তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দু একথা যেন না ভোলেন যে যদি তাঁহারা তাঁহাদের অশিক্ষিত দেশভ্রাতাগণকে চণ্ডাল, অন্ত্যজ, পঞ্চমা প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক অভিধানে অভিহিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা সমগ্র হিন্দু জাতির উন্নতির আশা সমূলে নাশ করিবেন।" এই কথাই আমাদের কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

এই তথাকথিত অনুন্নত সমাজের প্রতি সমাজের কর্তব্য কি, তাঁহা প্রফুল্লচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিয়াছেন—

"আমাদের কর্তব্য, যারা পশ্চাৎপদ তাদের সকলকে টেনে তুলি। আমরা দেশকে মা বলি। যাঁরা লম্বা বক্তৃতা করেন, আমি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি তাঁরা যদি বাঙলাকে মা বলেন, তবে কি সকলকে ভাই বলে আলিঙ্গন করবেন না—মায়ের সন্তানকে দূরে ঠেলে তাঁরা অগ্রসর হবেন ?—তবে তাঁহাদের কিসের মা বলা ?

"সবাই মায়ের সন্তান—সকলকে টেনে নিতে হবে। যে পেছনে আছে তাকে তুলতে হবে। যিনি শিক্ষিত তিনি অশিক্ষিতকে টেনে নেবেন।"

তারপর নারীসমাজের সমস্যা তাঁহার মনে জাগিয়াছে। নারী জাতির উন্নতি ব্যতিরেকে জাতীয় পঙ্গুতা দূর হইবার নয়। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"এই যে একই সমাজের স্ত্রী ও পুরুষদের মধ্যে একটা বিপুল ব্যবধান—ইহা আমাদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। It is the woman of India who really belong to the depressed class—আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরাই প্রকৃতপক্ষে অনুন্নত জাতিভুক্ত। মাতৃজাতির অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য সামর্থ্য আমাদের নাই—কোন্ মুখে আমরা স্বরাজ লাভের যোগ্য বলি ?"

অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজের আর এক দুরপনেয় কলঙ্ক। রাষ্ট্র-নেতা মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই ইহার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আন্দোলন চালাইয়াছেন। চল্লিশ বছর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছিলেন—

"যে ধর্ম গরীবের দুঃখ বোঝে না, মানুষকে উন্নত করে না, তাহা ধর্ম নামের যোগ্য নহে। আমাদের ধর্ম এক্ষণে কেবল ছুঁৎমার্গে পরিণত হইয়াছে—কাহাকে ছুঁইতে পারা যায়, কাহাকে ছুঁইতে পারা যায় না, তাহারই বিচারে পরিণত হইয়াছে। হা ঈশ্বর! যে

দেশের সর্বপ্রধান পণ্ডিতগণ ডান হাতে খাইব না বাঁ হাতে খাইব এইরূপ কঠিন সমস্যার মীমাংসায় গত দুই হাজার বৎসর ব্যস্ত আছেন, সে দেশের অধঃপতন হইবে না ত হইবে কাহার ?”

প্রফুল্লচন্দ্র সে কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—“এ ভণ্ডামি আর চল্‌বে না। বরফ খাব, সোডা খাব, ষ্টীমারে বাবুর্চির রান্না খাব, সাহেবের হোটেলে খাব, আবার নামাবলীও ঠিক রাখব, তা হয় না। এই ছুঁৎমার্গের হাত এড়াতে না পারলে হিন্দুধর্ম পৃথিবী হতে লোপ পাবে। এসব ছাই-পাঁশ দূরে ফেলে দিয়ে, হিন্দুজাতিকে বক্ষ বিস্তার করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে; নোংরা দেশাচার পাপাচার আঁকড়ে থাক্‌লে চল্‌বে না।”

সাহিত্য-সাধনা ও জাতীয় শিক্ষা

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?" —নিধুবাবু

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রাসায়নিক হইলেও সাহিত্য-চর্চা তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রচেষ্টা। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অনুরাগী ভক্ত। হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস তাঁহার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের বড় নিদর্শন—যদিও উহা ইংরাজীতে লিখা। তাঁহার বক্তৃতাসমূহ সারগর্ভ ও জাতীয় জীবন গঠনের উপাদানে পরিপূর্ণ। তাঁহার লেখাগুলির অধিকাংশই অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের, সামান্য কিছু শিক্ষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়। 'বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' ও 'অন্নসমস্যা'—তাঁহার এই পুস্তিকা দুইখানি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। উহা হইতে অনেক কথা এই পুঁথিতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ধারাবাহিক ভাবে প্রফুল্লচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছেন। 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ধারা' নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ইহার পরিচয় দেয়। প্রফুল্লচন্দ্র রাজসাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের (১৩১৫ সালে) সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। বাংলায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য যাহাতে সৃষ্টি ও পুষ্টিলাভ করে, তিনি এই সভায় বিশেষভাবে বলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা যতদিন স্বাধীন ভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, ততদিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র্য ঘুচিবে না।" প্রফুল্লচন্দ্র অনেক

মাসিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখিতেন। 'বঙ্গবাণী' 'প্রবাসী' 'বসুমতীতে' তাঁহার অনেক চিন্তাশীল রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে দেশে যাহাতে সুশিক্ষা ও জাতীয় শিক্ষা প্রসারিত হয়, তাহার জন্যও প্রফুল্লচন্দ্র কম করেন নাই। ১৯২২ সালে বিজ্ঞান-চচার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজার টাকা দান করেন। ১৯২৫ সালে যখন তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আহূত হইয়া বক্তৃতা দিতে যান, সে উপলক্ষে পারিশ্রমিক বাবদ সমুদায় টাকা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যর্পণ করেন। আচার্যের বয়স ষাট বছর পূর্ণ হইলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করেন। কারণ তিনি যে 'পালিত' অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই পালিত ট্রাষ্টের নিয়ম অনুসারে অধ্যাপকের ষাট বৎসর পূর্ণ হইলে কর্মত্যাগ করা দরকার। অবশ্য ট্রাষ্টিরা ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার পদ-ত্যাগপত্র পাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার কর্মকাল আরও পাঁচ বছর বাড়াইয়া দিলেন। এই সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহাতে তাহার হৃদয়ের মহত্ত্ব ও জ্ঞান-বিস্তারের আগ্রহ পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমার জীবনের বাকী দিনগুলি বিজ্ঞান-মন্দিরে কাটাইয়া দিতে খুবই ইচ্ছা করি, কিন্তু এই কাজের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিকট হইতে আর পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে অক্ষম। সেই জন্য আমার নিবেদন যে, পালিত অধ্যাপকের প্রাপ্য মাসিক এক হাজার টাকা আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যর্পণ করিতেছি, যাহাতে এই টাকা বিজ্ঞান-মন্দিরে রাসায়নিক বিভাগে ব্যয় হইতে পারে।"

দেশে যাহাতে জাতীয় শিক্ষার বিস্তার হয়, প্রফুল্লচন্দ্র তজ্জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দান করেন। জাতীয় শিক্ষায় তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং ইহার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্ (National Council of Education) স্যর আশুতোষ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁহাকেই সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছিলেন।

দেশের যেখানে কোন জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অমনি ডাক পড়িয়াছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের। তিনিই এই নূতন যজ্ঞের পৌরোহিত্য করিয়াছেন, তবেই অনুষ্ঠান শুদ্ধ হইয়াছে, সার্থক হইয়াছে। ১৯২৩ সালে আলিগড় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে আহ্বান করেন, উপাধি দান-সভার সভাপতিত্ব করিতে। সে কথা উল্লেখ করিয়া তিনি একবার বলিয়াছিলেন—"মুসলমানগণ আমাকে আলিগড় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উপলক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না, কয়দিন পরে আবার সবরমতী গুজরাট বিদ্যাপীঠে—যেখানে মহাত্মার আশ্রম—তাহার ভিত্তি সংস্থাপনের জন্য আহূত হই। বাংলা দেশেও যত জাতীয় বিদ্যালয় সব স্থান হইতে আহ্বান পাই।"

আলিগড়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতামন্ত্র হওয়া উচিত যা স্যার আশুতোষ বলিয়াছিলেন— Freedom first, freedom second, freedom always.

চরকা ও খদ্দর

'আরাম-প্রিয় বিলাসে নিমজ্জিত আমাদের দেশের বুদ্ধিমানরা জিজ্ঞাসা করেন, 'দেশের জন্য আর কি করিব ?' আমি বলি 'কি করিয়াছ ? খদ্দর পর, পরাও।'

খদ্দর পরার অর্থ শুধু খদ্দর পরিধান করা নহে, যে পরিবারে খদ্দর ঢুকিয়াছে সে পরিবারে এক নূতন আলোক প্রবেশ করিয়াছে, খদ্দর মানসিক পরিবর্তন আনে।

প্রতি বৎসর শোণিতসম ত্রিশ কোটি টাকা বস্ত্রের জন্য দরিদ্র দেশ (বঙ্গ) হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে—ইহার নিবারণে প্রত্যেকে সাহায্য করিবেন।

"খদ্দর আমাদের বাঁচন কাঠি, খদ্দর আমাদের দেশাত্মবোধের প্রতীক।"

পূর্বেই বলিয়াছি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রথমে চরকায় বড় একটা বিশ্বাস করিতেন না। খুলনা দুর্ভিক্ষ ও উত্তরবঙ্গ বন্যার পর চরকার উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে তিনি উপলব্ধি করেন। কিরূপে তিনি খদ্দরের ভক্ত ও প্রচারক হইয়া দাঁড়াইলেন, সেই কথা নিজেই বলিয়াছেন—"যখন আমি খদ্দরের প্রচার-ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আরো অনেকেরই মত আমি খদ্দরের পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আমার শিষ্য ও বন্ধুবর্গের সহিত ক্রমাগত আলোচনার ফলে বুঝিতে পারিলাম, খদ্দর শুধু রাজনীতিক মুক্তি সাধনের অস্ত্র নহে,—খদ্দর মানবজীবনের সহজ সরল গতির মূর্ত প্রকাশ, ন্যায় ও সত্যের দ্বিধাহীন সঙ্কোচহীন আবরণ।"

তারপর হইতেই চরকা ও খদ্দরের জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। বাংলা দেশে খদ্দরের উৎপাদন ও প্রচলন তাঁহারই উৎসাহে ও প্রেরণায় এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ কয়েক বৎসর যাবৎ খদ্দরের জন্য তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা দেখিয়া, অনেকেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন—ডাঃ রায় কি বিজ্ঞান-চর্চা ভুলিয়া গিয়াছেন, এখন তিনি খদ্দরের ব্যাপারী ? এই কথার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,

—"অনেকে বলেন যে আমি এখন তাঁত, চরকা, তানা, নলী নিয়ে থাকি এবং রসায়নশাস্ত্র ভুলে গেছি, কিন্তু গত দুই বৎসরে স্বাধীন গবেষণামূলক আমার যত প্রবন্ধ বেড়িয়েছে তেমন জীবনে হয় নাই। আমি রাত্রিতে মোটেই পড়ি না, কিন্তু ২৪ ঘণ্টার ভিতর ১০ ঘণ্টা বাদ দিলেও বাকী ১৪ ঘণ্টায় কত কাজ করা যায়।"

গত অসহযোগ আন্দোলন কালে যখন সমস্ত ভারতে খদ্দরের পুনরুত্থান হইল, সেই সময়ে বাংলার মান রাখিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তিনি আজীবন বেঙ্গল কেমিক্যাল ও অন্যান্য কোম্পানীর শেয়ারে ৫৬০০০৲ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই সমুদায় টাকা তিনি খাদি প্রচারের জন্য দান করিলেন। কলিকাতার নিকটবর্তী সোদপুরে 'খাদি প্রতিষ্ঠান' প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বদেশী ব্রতের উপকরণ যোগাইল। চারিদিকে প্রফুল্লচন্দ্রের কীর্তি ঘোষিত হইল। বাস্তবিক পক্ষে প্রফুল্লচন্দ্র যাহা আঁকড়াইয়া ধরেন, তাহাই সফল করিয়া তুলেন। এমন মনের বল কম লোকেরই দেখা যায়।

খাদি প্রচারে আচার্যের এই কার্যে একান্ত নিষ্ঠার সহিত জীবন পণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালের তাঁহার প্রাক্তন সহকর্মী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়। বস্তুতঃ তাঁহাকে খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ বলিলেই চলে।

যুবকদিগের প্রতি উপদেশ ও অনুপ্রেরণা

প্রফুল্লচন্দ্র চিরকুমার ছিলেন। বাংলার তরুণদলই তাঁহার সন্তানের স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়া আসিয়াছে। ছেলেদের তিনি যেমন ভালবাসিতেন, ছেলেরাও তাঁহাকে তেমন শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। তাই যখনই ছেলেরা তাঁহাকে ডাকিয়াছে, তিনি তখনই তাহাদের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ১৩৩১ সনে সিরাজগঞ্জ ছাত্র-সম্মেলনের সভাপতিরূপে সত্যই তিনি বলিয়াছিলেন—

"আমি তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি যে সকলে টেনে এনে আজকার সভাপতি পদে আমাকে বরণ করেছ। ছাত্রেরা ডাক্‌লে আমি না সাড়া দিয়ে থাক্‌তে পারি না, তাহারা ভবিষ্যতের আশা, তাদের দিক চেয়ে এই বৃদ্ধ বয়সেও বেঁচে আছি। বাঙালী ছাত্রদের দ্বারা অসাধ্য সাধন হবে—শুধু যোগ্য নেতার অভাব, পরিচালকের অভাব। উপযুক্ত নেতা থাক্‌লে কি হতে পারে তা জগলুল পাশা, কামাল পাশার কথায় বলেছি।"

আর একবার এমনতর কথাই ছাত্রদের বলিয়াছিলেন—"এতকাল আমি বাংলার ছাত্রসমাজের মধ্যে বাস করে আস্‌ছি, ছাত্রদের যা আনন্দ, আমারও সেই আনন্দ, তাদের যা দুঃখ আমারও সেই দুঃখ। তাদের আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখেরও আমি অংশীদার। তাই তোমরা ছাত্রবৃন্দ, যখন আমায় আহ্বান করলে তখন আমি তোমাদের কথা না শুনে থাক্‌তে পারলাম না। আমি ছাত্রবর্গে পরিবৃত হ'য়ে থাকি ব'লে, জরাবার্ধক্যেও শক্তি-সামর্থ্যের অপচয় ভুলে যাই।"

বাংলার যুবক ও নব্য চীন

"যুবকেরাই জাতির প্রাণ—জাতির জীবনশক্তি। তাই আশা হয় বাঙালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার হইবে না। যে দেশে বিধির বিধানে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি সেই দেশের যুবকেরা মহাপুরুষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ত্যাগ ও বীরত্বে বাঙালী জাতিকে উজ্জ্বল করুন—ঈশ্বরের শক্তি যেন তাহাদের জীবনের পথে চির সহায় হয়।

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

দেশের এই যুবকদল—ছাত্রদল, ইহারাই যে জাতির সমস্ত সমস্যা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা-বিষয়ক সকল কিছু সমাধান করিতে পারিবে, ইহা আচার্য দেব মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। তাই তিনি চীনের ইতিহাস হইতে চীনা ছাত্রদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বাংলার ছাত্র-সমাজকেও এই কার্যে প্রেরণা দিয়াছেন। নব্য চীনের জাগরণ বাংলার জাতীয় জীবনের পক্ষে মস্ত-বড় শিক্ষার বিষয়। নব্য চীনের কথায় আচার্য বলিয়াছেন,—

"এই নবজাগরণের ফলে ১৯০৬-০৭ সালে বিশ হাজার চীনা ছাত্র শিক্ষার্থিরূপে জাপানে উপস্থিত হইল—দলে দলে চীনা ছাত্র য়ুরোপ ও আমেরিকা ছাইয়া ফেলিল। কি করিয়া জন্মভূমির দুর্দশা ঘুচিবে, কি ভাবে নবীন চীন সভ্য জগতে শ্রদ্ধার আসন গ্রহণ করিবে, সকলেই এই এক মহান্ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এই বিশ হাজার ছাত্রের অধিকাংশই অতি দরিদ্র—সারাদিন কুলীগিরি করিয়া, জুতা সেলাই করিয়া, হোটেলে খানসামাগিরি করিয়া যাহা উপার্জন করিত, তাহার সাহায্যে ইহারা নিজেদের খরচ চালাইত ও সন্ধ্যার পর নৈশবিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিত।"

"তাহারা যে কেবল নিজেরা শিক্ষালাভ করিয়া ক্ষান্ত রহিল তাহা নহে। একটি বিরাট সঙ্ঘও স্থাপন করিল। উহার

নাম Movement for education of illiterates in China অর্থাৎ চীনের নিরক্ষরদের শিক্ষাদান করিবার আন্দোলন।

"স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, অবকাশের সময়ে তাহারা নিরক্ষর গ্রামবাসীদের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মাবকাশে সহস্র সহস্র ছাত্র সমস্ত চীনদেশে ছড়াইয়া পড়িল, ছাত্রদিগের অনেকেই অতি দরিদ্র, অনেকেই দিনের বেলায় ছোট খাট জিনিষ ফিরি করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করিত তাহার সাহায্যেই নিজেদের খরচ চালাইয়া লইত এবং রাত্রিতে পল্লীতে পল্লীতে নৈশবিদ্যালয়ে অশিক্ষিত গ্রাম-বাসিগণকে শিক্ষা দিত। মাঝে মাঝে গ্রামের সমস্ত বয়স্ক লোকদের একত্র করিয়া তাহারা সাধারণের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিত।"

কিন্তু ইহাতেই চীনা ছাত্রগণের কাজ শেষ হইল না। তাহারা "অতঃপর গ্রাম্যভাষায় লিখিত সহজপাঠ্য পুস্তক রচনায় মন দিল। চীনের লেখ্যভাষা এত কঠিন ও দুর্বোধ্য যে, তাহা শুধু সুশিক্ষিত লোকের মধ্যেই আবদ্ধ, জন-সাধারণের সঙ্গে সে ভাষার কোন যোগাযোগ নাই। অবিলম্বে শত শত শিক্ষিত যুবক চীনদেশের অমূল্য সম্পদ পুরাতন নীতিগ্রন্থগুলিকে সাধারণ বোধগম্য সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে লাগিল।

অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যুবকগণের এই অভিযান শুধু নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, সাময়িক বক্তৃতা প্রদান ও সরল পুস্তক প্রণয়নেই পর্যবসিত হয় নাই, দেশের দুর্দশা যাহাতে আপামর জন-সাধারণের উপলব্ধিগত হয়, লোকের মধ্যে উন্নতির তীব্র স্পৃহা জাগ্রত হয়, তাহার চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই। অবকাশ সময়ে দলে দলে ছাত্র চীনের পল্লীতে পল্লীতে পতাকাহস্তে দেখা দিয়াছে। এই সকল পতাকার কোনটিতে হয়ত লিখিত আছে, "অশিক্ষিত মানুষ অন্ধ অপেক্ষাও অধম", কোনটিতে

হয়ত লেখা রহিয়াছে, "চীন জাগো, জাপান যে অসাধ্য সাধন করিয়াছে তুমি তাহা পারিবে না কেন ?"

যে সকল সমস্যা চীনা ছাত্রদের এরূপ কর্ম-পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, বাঙালী ছাত্রদলকে সেই সকল সমস্যাব মীমাংসায়ই আত্মবলি দিতে হইবে। তাই চীনা ছাত্রদের উৎসাহবাণী উচ্চারণ করিয়া আচার্য রায়ের ভাষায় বাংলার তরুণদের আহ্বান কবিতেছি—

"হে বঙ্গদেশীয় যুবকগণ—যুবক ও ছাত্রবৃন্দ তোমরাই আমাদের ভাবী আশাস্থল। একবার বুকে হাত দিয়া আত্মপরীক্ষা করিয়া বল দেখি, তোমরা চীনের যুবকদের তুলনায় তাহাদের সহস্রাংশের এক অংশ শক্তিও দেশের কল্যাণকর কাজে নিয়োগ কবিতেছ কিনা ?"

চীন যাহা পাবিয়াছে, তোমরা তাহা পারিবে না কেন ?

আশা ও আকাঙ্ক্ষা

বাঙালী জাতি যাহাতে অর্থে-সামর্থ্যে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সব দিক্ দিয়াই জগতের সমক্ষে সগর্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, ইহাই আচার্যদেবের আকৈশোরের কাম্য ছিল। বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত। তাই দেখি প্রফুল্লচন্দ্র যাহা কিছু করিয়াছেন সব কিছুরই মূলে রহিয়াছে জাতীয় কল্যাণ। তিনি রাসায়নিক গবেষণা করিতেন, অর্থ নৈতিক বক্তৃতা দিতেন, সামাজিক সমস্যার আলোচনা করিতেন, দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, যাহা কিছু করিতেন—সকলেরই লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য এক, তাহা জাতীয় কল্যাণ। অনেকে তাঁহার বকুনি শুনিয়া বলিতে পারেন, আচার্য বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঘোর সংশয়ী। কিন্তু তাহা মোটেই নয়। বাঙালীর উপর তাঁহার কত বড় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"আমরা নষ্ট হয়েছি সাধনার অভাবে, সঙ্কুচিত হয়েছি স্বার্থ-পরতার প্রভাবে। তাই বিদ্যাক্ষেত্রে, ব্যবসাক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই হঠে গিয়ে পিছনে পড়ে গেছি। সর্বনাশকারী পল্লবগ্রাহিতা আমাদের নষ্ট করেছে। ৺প্রতাপ মজুমদার বলেছেন, 'জাপানীরা অপেক্ষাকৃত হাঁদা, বাঙালী অতি বুদ্ধিমান্।' আত্মঘাতী উদ্যমহীনতা আমাদিগকে স্বল্পায়াসে কৃতকার্যতা লাভ করতে চেষ্টিত করে। তাই আজ সব ক্ষেত্রেই চাই সাধনা।"

'আমার স্থির বিশ্বাস, বাঙালীর দ্বারাই ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের পথ উন্মুক্ত হ'বে, কিন্তু এই গৌরবের পদ অধিকার কর্‌তে হ'লে বাঙালীর জীবনে চাই সাধনা—তিল তিল ক'রে আত্মদান। বাঙালী আজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে ব্যক্তিগত সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের কাজে লে'গে প'ড়ে থাক্‌লে ভারতের নিদারুণ দুর্দশা ঘুচ বেই। আজ বিধাতার ইঙ্গিত—বাঙালীর সাধনা ভারতের সিদ্ধি আনয়ন কর্‌বে।'

আচার্যদেবের এই বাণী সফল হোক্, সত্য হোক্, সার্থক হোক্।

প্রয়াণ

আচার্যদেব ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে দেহত্যাগ করেন। এই দিবসেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও কয়েক বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। নিমতলা শ্মশানঘাটে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চিতাপার্শ্বে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়। আচার্যদেব আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রাখিয়া গিয়াছেন এক দল বৈজ্ঞানিক, 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' আর তাঁহাব একনিষ্ঠ বিজ্ঞান সাধনার দান ও উৎসাহোদ্দীপক বাণী। মানবের কল্যাণ সাধনায় তাঁহার কার্য ও দান চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
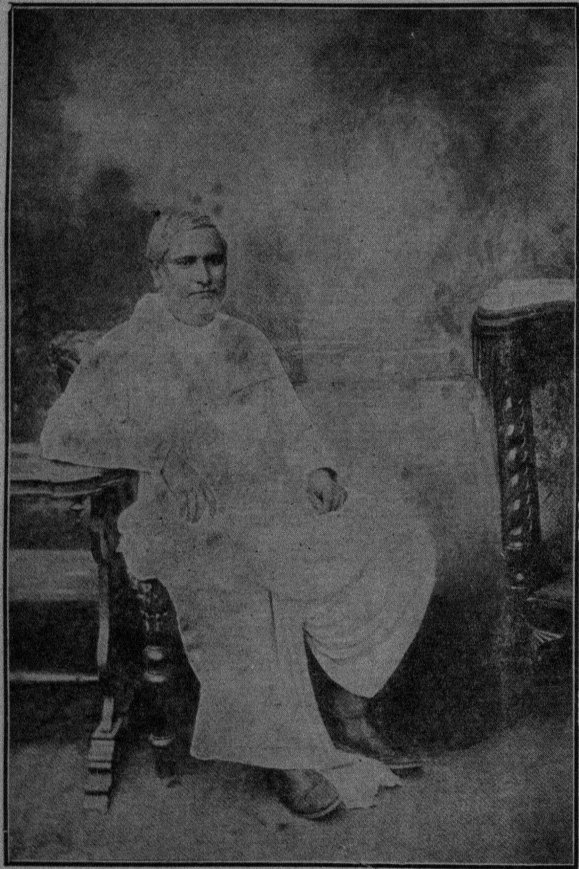
আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর

বাংলা সাহিত্যে যে কয়জন মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক বিজ্ঞানের কথা সহজ, সরল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় অগ্রণী। অবৈজ্ঞানিক দেশবাসীর নিকট বিজ্ঞানের মোটা কথাগুলি এমন জলের মত করিয়া কেহ আজও বলিতে পারেন নাই। রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক লেখায় আড়ষ্টতা নাই, দুর্বোধ্যতা নাই—সে লেখা হাস্যময়, কৌতুকময়, উচ্ছল উদ্বেল তাহার গতি।

সারাটা জীবন রামেন্দ্রসুন্দর রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার শীর্ণ ক্লীষ্ট গম্ভীর মুখখানির দিকে চাহিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না যে, ইহার অন্তরে এত হাসি, এত রঙ্গ, এত আনন্দ জমিয়া আছে। তাঁহার এই অন্তরের সিক্ততা তাঁহার বৈজ্ঞানিক লেখার শুষ্ক নীরস কাঠিন্য দূর করিয়া দিয়া বর্ষার কালো মেঘের সজলতা ও উদ্বেলতা আনিয়া দিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের এই সত্যকার রূপটি একদিন কবির চোখে ধরা দিয়াছিল। তাই সেদিন পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ হইলে রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দরকে অভিনন্দিত করিয়া বলিয়াছিলেন—"আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।"

ছাত্রজীবনে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছেন, কর্মজীবনে বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিয়াছেন, বিজ্ঞানের মোটা কথা সোজা ভাষায় পুঁথিতে লিখিয়াছেন, বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে আলোচনাও করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যথার্থতঃ বৈজ্ঞানিক হিসাবে পরিচিত হন নাই। তিনি অন্তরে অন্তরে সাহিত্যিক ও

দার্শনিক ছিলেন। সত্যই সেদিন সুরেশ সমাজপতি মহাশয় বলিয়াছিলেন—"দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা—মানব চিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্র-সঙ্গমে যুক্ত-বেণীতে পরিণত হইয়াছিল।" এই জন্যই তাঁহার বিজ্ঞানের লেখাগুলিও এমন সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্বপুরুষেরা বাঙালী ছিলেন না। তাঁহারা কয়েক শ' বছর আগে এদেশে আসেন এবং ধীরে ধীরে বাঙালীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জেমো তাঁহাদের বাসভূমি।

১২৭১ সালে ৫ই ভাদ্র রামেন্দ্রসুন্দর জেমো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী এবং মাতা চন্দ্রকামিনী দেবী। রামেন্দ্রসুন্দর বাল্যকালে ভাল ছাত্র ছিলেন। তিনি কান্দি হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং উক্ত পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে যাইয়া ভর্তি হইলেন। এই কলেজ হইতে তিনি এফ্-এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। ইহার পর তিনি বি-এ পড়িবার সময় বিজ্ঞান-শাস্ত্র পাঠ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৬ সালে উক্ত পরীক্ষায় অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষা দিলেন। এই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে পেড্লার সাহেব রসায়ন শাস্ত্রের খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের বি-এ পরীক্ষার উত্তর দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি ক্লাসে সকল ছেলের সম্মুখে বলিয়াছিলেন—"আমি এ পর্যন্ত যত রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এইখানি out of the way the best।" ১৮৮৭ সালে তিনি এম্-এ

পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার পর বৎসর তিনি পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা প্রদান করেন এবং ৮০০০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পর তিনি দুই বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজের পরীক্ষাগারে বিজ্ঞান-চর্চা করেন।

১৮৯২ সালে রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইলেন এবং সপরিবারে কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বাংলার অন্যতম সাহিত্যিক স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও পরম বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। বঙ্গবাসী কলেজের ভূতপূর্ব হাস্যরসিক বিজ্ঞ অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বও এই সময়েই হয়। ইঁহাদের বাসা তাঁহার বাসার প্রায় সংলগ্ন ছিল। রিপন কলেজে বছরখানেক অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি অবশেষে অধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং এই পদেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের অধ্যাপনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী ছিল। বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব এমন সুন্দরভাবে খুব কম শিক্ষকই বুঝাইতে পারেন। তাঁহার ছাত্রগণও এমন শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া সর্বত্র সমাদর লাভ করিত। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এরূপ প্রীতিপ্রদ সম্পর্ক আজকাল বড় দেখা যায় না।

১৩১২ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময় রামেন্দ্রসুন্দর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' নামে একখানি চমৎকার পুস্তিকা লিখিয়া বঙ্গলক্ষ্মীদের মধ্যে স্বদেশী প্রচারে সাহায্য করেন। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিচ্ছেদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। 'অরন্ধন' ও 'রাখী-বন্ধন' অনুষ্ঠানের তিনি একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। উঁহার দুই একটি কথা আজও লোকে ভুলে নাই।—

"বন্দেমাতরম্। বাংলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ

গড়্‌লেন। প্রয়াগ কাশী পার হয়ে, মা পূর্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা সেখানে শতমুখী হলেন, শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন, তখন লক্ষ্মী এসে সেই শত মুখে অধিষ্ঠান করলেন, বাঙলার লক্ষ্মী বাংলা দেশ জুড়ে বস্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগ্‌লেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্‌ল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগ্‌ল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি। লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগ্‌ল।

"মা লক্ষ্মী, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবোনা। শাখা থাকতে চুড়ি পর্‌বো না। ঘরের থাক্‌তে পরের নেবোনা। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবোনা ও পরের ধন হাতে তুল্‌বো না। মোটা অন্ন ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ কর্‌বো। পড়শী খাইয়ে নিজে খাবো। ভাইকে খাইয়ে পরে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক্। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকুন।"

১৩১২ সালে রামেন্দ্রসুন্দরের বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে তাঁহাকে এক অভিনন্দন দেওয়া হয়। রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে সাহিত্য-পরিষদ্ নব-ভবনে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ এরূপ সমৃদ্ধ হইয়া দাঁড়াইত না যদি ইহার পিছনে কর্ণধার রামেন্দ্রসুন্দর না থাকিতেন। তিনি বহু বৎসর ইহার সম্পাদক ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদ্ রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের অক্ষয় কীর্তি।

ইহার পর রামেন্দ্রসুন্দর অধিক দিন বাঁচেন নাই। তাঁহার স্বাস্থ্য অনেক দিন হইতেই অত্যন্ত খারাপ ছিল। জীবনের শেষ কয় বছর চিররুগ্ন হইয়াই তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছিল। ১৩২৬ সালে ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রামেন্দ্রসুন্দর অপরিণত বার্ধক্যে সকলকে

শোক-সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শাস্ত্রী হরপ্রসাদ আক্ষেপে বলিয়া উঠিলেন—"আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যার একটা বড় জাহাজ ডুবিয়া গেল।"

রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ হয় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের ভিতর দিয়া। বাংলা ভাষায় যাহাতে একটা সুপরিপুষ্ট বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে তজ্জন্য তাঁহার মন সর্বদা বিব্রত থাকিত। ১৩১০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতিরূপে তিনি বলিয়াছিলেন—"বাংলা ভাষা এখনও বিজ্ঞান প্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে; কিন্তু এই বিলম্ব ক্রমেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। আমাদের বাংলা ভাষা বর্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অপুষ্ট হউক, উহাদ্বারা বিজ্ঞানবিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি।"

রামেন্দ্রসুন্দরের লেখার হাতেখড়ি হয় স্বর্গীয় সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায়। তখন তিনি বি-এ পড়িতেছেন। ইহার পর সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাধনা', বঙ্গবাসীর ,জন্মভূমি', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'দাসী', সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের 'সাহিত্য', সরলা দেবীর 'ভারতী', এবং 'মানসী', 'বঙ্গদর্শন', 'প্রদীপ', 'উপাসনা', 'ভারতবর্ষ', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' প্রভৃতি বহু পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ব্যতীত দার্শনিক ও চিন্তাশীল রচনাও অনেক লিখিয়াছেন। ১৩০৩ সালে তিনি 'প্রকৃতি' নামে একখানি গ্রন্থ লিখেন। এই পুস্তক অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সমষ্টি। ১৩১০ সালে তাঁহার 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধও আছে। ইহা ছাড়া তাঁহার রচিত আরো অনেকগুলি বই প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩১৭ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য বিজ্ঞানের স্থূল বিষয়গুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। তিনি

সাহিত্য-পরিষদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতির উৎসাহী সম্পাদক ছিলেন। বাংলায় বিজ্ঞান-চর্চায় তাঁহার অনুরাগ ছিল। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দসমূহ সৃষ্টি ও গঠন করিয়া তিনি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'শব্দ-কথা' নামক গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, রাসায়নিক পরিভাষা, বৈদ্যক পরিভাষা, শরীর-বিজ্ঞান পরিভাষা ও বাংলার প্রথম রাসায়নিক গ্রন্থ প্রভৃতি প্রবন্ধ উপাদেয়। বাংলা ভাষায় নবগঠিত পারিভাষিক শব্দ সহযোগে বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ প্রচার সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—"পাশ্চাত্য জাতির উপার্জিত জ্ঞানরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য আমাদিগকে পাশ্চাত্য ভাষার অনুশীলন করিতে হইবে। কিন্তু ঐ বিজাতীয় ভাষা কখন আমাদের আপনার ভাষা হইবে না, কখন আমরা অন্তরের কথা ঐ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। যদি আমাদের স্বজাতিকে ও আমাদের আত্মীয়বর্গকে পাশ্চাত্য জাতির উপার্জিত জ্ঞান-সম্পত্তির অধিকারী করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের মাতৃভাষাকে এইরূপে সংস্কৃত ও মার্জিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে সেই মাতৃভাষা এই জ্ঞানবিস্তার কর্মের ও জ্ঞানপ্রচার কর্মের যোগ্য হয়। এই বঙ্গ-ভাষারই অঙ্গে নূতন রক্ত সঞ্চালিত করিয়া তাহাকে পুষ্ট সমর্থ পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে। এই কার্য সম্পাদন এখন কৃতী বাঙালীর অন্যতম কার্য।"

সাহিত্য-সেবায় বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দরের এক উদার লক্ষ্য ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—

"সাহিত্য-সেবার মধ্যে কেহ কবি, কেহ ঔপন্যাসিক, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ জ্ঞান-প্রচারে ব্রতী, কেহ ভক্তি-পথের উপদেষ্টা, কেহ কর্মমার্গের প্রদর্শক। কিন্তু আজিকার দিনে বঙ্গের সাহিত্য-সেবীর এক বই দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতে পারে না। যিনি যে কামনা করিয়া কর্ম করিবেন, তাঁহাকে সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীর চরণে সেই কর্মফল অর্পণ করিতে হইবে। যিনি যে ফুল আহরণ করিবেন, সে সকল ফুল সেই রাঙ্গা চরণের রক্তজবার সহিত মিশাইতে হইবে।"

নব্য বাঙ্‌লার বৈজ্ঞানিক

ডাঃ মেঘনাদ সাহা

নব্য বাঙ্‌লায় যে বৈজ্ঞানিক-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে, ডাঃ মেঘনাদ সাহা তাঁহাদের অন্যতম। বাঙালী শুধু ভাবুক স্বপ্নবিলাসী—কর্মজগতে একেবারে অকর্মণ্য, এই অমূলক অপবাদ ঘুচাইয়া দিয়া যাঁহারা বাংলায় বিজ্ঞানের জয়ধ্বজা তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহাদেরই একজন প্রতিভাদীপ্ত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা।

প্রবল প্রতিপক্ষ ও বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের সহিত অনবরত সংগ্রাম করিয়া কিরূপে জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় এবং মহৎ ও বৃহৎ জীবন গঠন করিতে হয়, মেঘনাদ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই ডাঃ মেঘনাদের জীবনী আজিকায় জাতীয় অভ্যুত্থানের দিনে বাংলার তরুণদের বিশেষ ভাবে অনুকরণীয়।

ইংরাজী ১৮৯৩ সালে ঢাকা জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত সেওরাতলী গ্রামে এক নিঃস্ব সাহা পরিবারে মেঘনাদের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় জগন্নাথ সাহার অবস্থা নিতান্ত অস্বচ্ছল ছিল। সামান্য ব্যবসায়ে কোন রকমে দিন কাটিত। দিন-রাত্রি খাটিয়া বৃদ্ধ পিতা সংসারটিকে রক্ষা করিয়া চলিতেন।

নিজ গ্রামে প্রথমতঃ গুরুমহাশয়ের নিকট, পরে বরিশাল-কীর্তিপাশা-বাসী শশিভূষণ চক্রবর্তী নামক একজন বিদেশী ভদ্রলোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেঘনাদ বিদ্যাশিক্ষার জন্য ভর্তি হইলেন। ইহাই মেঘনাদের ছাত্র-জীবনের সূচনা। ইহার পর একাদশবর্ষ বয়সে ছয় মাইল দূরবর্তী সিমুলিয়া গ্রামে মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কাশীমপুরের জমিদারের সহৃদয় গৃহ-চিকিৎসক ডাক্তার অনন্তকুমার দাস মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া তিনি পড়াশুনা করেন। এই বিদ্যালয় হইতে ১৯০৫ সালে মাইনর বৃত্তি পরীক্ষায়

প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং মাসিক ৪৲ করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি পাওয়ার পর পড়ার খুব সুবিধা হইল, নতুবা তাঁহার দরিদ্র পিতার পক্ষে পুত্রের পরবর্তী শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করার সাধ্য ছিল না। এই বৃত্তি পাওয়ার ফলে তিনি স্কুলে বিনা বেতনে পড়িতে পারেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্কুলে তিনি প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে তাঁহাকে ঐ স্কুল পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সময়ে দেশে স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছিল, মেঘনাদ বাল্যকাল হইতে একটু স্বাধীন প্রকৃতির ছেলে ছিলেন। স্বদেশ-প্রেম বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনে জাগ্রত ছিল। প্রায়ই তিনি খালি পায়ে স্কুলে যাইতেন, নিতান্ত সাদাসিধে তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল। এক দিন হেড্‌মাষ্টার বাবু রাজকুমাব দাস ইন্‌স্‌পেক্‌টার অব স্কুলস্‌-এব নির্দেশক্রমে আদেশ দিলেন, সকলকে জুতা পরিয়া স্কুলে আসিতে হইবে। অন্যান্য অনেক ছেলের সঙ্গে মেঘনাদ এই আদেশ প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহার বৃত্তি ও ফ্রী ষ্টুডেণ্টশিপ কাটা গেল। কাজেই বাধ্য হইয়া মেঘনাদ ঢাকা জুবিলী স্কুলে গিয়া ভর্তি হইলেন। এই জুবিলী স্কুল হইতে মেঘনাদ ১৯০৯ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। পূর্ববঙ্গ ও আসামে তিনি প্রথম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি মাসিক কুড়ি টাকা করিয়া বৃত্তি পান।

অতঃপর তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১১ সালে এই কলেজ হইতে আই-এস্‌সি পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন এবং মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পান। তিনি আই-এস্‌সি পড়ার সময়ে জার্মান ভাষা

অধ্যয়ন কবেন এবং এই বিষয়ে পরীক্ষা নেন। অঙ্কে ও রসায়ন শাস্ত্রে তিনি প্রথম হইয়াছিলেন। তৎপর মেঘনাদ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এস্‌সি ক্লাশে ভর্তি হন এবং পদার্থ-বিদ্যায় অনার্স গ্রহণ করেন ও ১৯১৩ সালে ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড হইয়া বি-এস্-সি পাশ করেন। এই কলেজের অধ্যাপক স্বনামধন্য বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচ রায়ের নিকট এবং বিখ্যাত গণিতাধ্যাপক ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের নিকট তিনি পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহার পর ইউনিভারসিটী কলেজে ফলিত গণিত-শাস্ত্রে ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড হইয়া ১৯১৫ সালে এম-এস্ সি পাশ করেন। গণিত তাঁহার প্রিয় বিষয় ছিল। তাঁহার সহপাঠী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই উ-য় পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকাব করিয়াছিলেন। মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ— এই সতীর্থদ্বয়ের মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতা চলিত।

এম্-এস্‌সি পাশ কবিবার পব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে তিনি প্রথমতঃ স্কলার ও পরে লেকচারার নিযুক্ত হন এবং অবসব সময়ে গবেষণা কবিতে থাকেন। ১৯১১ সালে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্ সি উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসরই তিনি আর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ দ্বারা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। এই বৃত্তি এবং স্যর আশুতোষ-প্রদত্ত গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি লইয়া ১৯২০ সালে বিলাতে যান। পাশ্চাত্যদেশে বৈজ্ঞানিক কার্য কিরূপ চলিতেছে সেই সকল দেখিবার উদ্দেশ্যেই তিনি বিদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে ইম্‌পিরিয়াল কলেজে ফাউলারের গবেষণাগারে এবং জর্মনীতে অধ্যাপক নার্ণষ্ট্-এর পরীক্ষাগারে কাজ করেন। উভয় স্থানে তিনি বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিকদের সহিত একত্র কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। উচ্চাঙ্গের মৌলিক গবেষণাদ্বারা উভয় স্থানেই তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। অতঃপর স্বদেশ ফিরিয়া

আসিলে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে মাসিক ৫০০৲ শত টাকা বেতনে বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ-বিদ্যার খয়রা অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। খয়রার রাজার প্রদত্ত অর্থ হইতে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ-বিদ্যার জন্য এই অধ্যাপকপদ নির্দিষ্ট আছে।

১৯২৩ সালে তাঁহার বন্ধু এলাহাবাদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলরতন ধরের চেষ্টায় মেঘনাদ এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। এখানে তাঁহার বেতন মাসিক ৮০০-১২৫০৲ টাকা ছিল। এই স্থানে নিয়মিত ভাবে পদার্থবিদ্যার গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন এবং অনেক মূল্যবান্ গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি ইহার মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে তাঁহার নূতন মতবাদ অত্যন্ত মূল্যবান্।

মেঘনাদ ফ্রান্সের জ্যোতিষিক পরিষদের আজীবন সভ্য এবং লণ্ডন পদার্থ-বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের ফাউণ্ডেশন ফেলো। ১৯২৬ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত ও পদার্থ বিদ্যা বিভাগের তিনি সভাপতি নিযুক্ত হন। বোম্বাই সহরের অধিবেশনে তিনি স্বীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার সমুদয় বিবরণ তাঁহার অভিভাষণে ব্যক্ত করেন। ১৯২৮ সালে তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মৌলিকতার জন্য ইংলণ্ডে রয়েল সোসাইটীর ফেলো বা সদস্য হন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে রয়েল সোসাইটী সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ ইহার সদস্য। ইংরেজ বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে ইহার সদস্য হওয়া যত সহজ, ভারতীয়দের পক্ষে তত সহজ নহে। এদেশে সর্বপ্রথম এফ্-আর-এস্ হন মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ স্বর্গীয় রামানুজম, তাহার পর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, তৎপর স্যর সি. ভি. রামন এবং পরে ডাঃ মেঘনাদ সাহা। ৩৫ বৎসর বয়স্ক একজন বঙ্গীয় যুবকের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

অধ্যাপক মেঘনাদ বিলাতে থাকিলে এবং ইংরাজ হইলে অনেক

করিয়া বিলাতে আর. এইচ. ফাউলার এবং আমেরিকার ঈ. এ. মিল্‌ন্ যথাক্রমে ১৯২৫ সালে এফ্‌-আর-এস্ হন। অথচ মেঘনাদ ইহাবও দুই তিন বছর পরে উক্ত সম্মান লাভ করিলেন। অবশ্য আগে ফেলো না হওয়ায় মেঘনাদেব গবেষণার মূল্য ও গুরুত্ব যে কম হইয়া গিযাছে, তাহা নয়। তবে এরূপ ব্যবহার রয়্যাল সোসাইটীব পক্ষে অগৌরব ও লজ্জাব বিষয বলিতে হইবে।

১৯২৭ সালে ইটালীব কোমো সহরে ভল্টা নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের শত বার্ষিকী স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভল্টা কোমো সহবে জন্মগ্রহণ কবেন এবং ১৩০ বৎসব পূর্বে তড়িৎ সম্বন্ধে নানা আবিষ্কাব ও যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে তড়িতের ব্যবহারিক প্রয়োগেব তিনিই পথ-প্রদর্শন কবেন। এই উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ নিমন্ত্রিত হন। ভাবতের প্রতিনিধিরূপে অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু এবং ডাঃ মেঘনাদ সাহা নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ণ সূর্যগ্রহণ নিরীক্ষক বৈজ্ঞানিকদলের সঙ্গে তিনি নরওয়েতেও গিযাছিলেন।

১৯৩৪ সালে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসেব বোম্বাই অধিবেশনে ডাঃ সাহা সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯৩৫ সালে কার্নেগী ট্রাষ্ট এর (Carnegie Trust of the British Empire) ফেলোরূপে তিনি ইংলণ্ড ও যুরোপে বিজ্ঞান-চর্চার উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করেন। ইহা ছাড়া তিনি বিদেশেব অনেক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ও প্রতিষ্ঠানে বহু বাব নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন, বক্তৃতা দিয়াছেন এবং গবেষণা করিয়াছেন।

ডাঃ সাহার উদ্যোগেই ভারতবর্ষে অনেক বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে উত্তর প্রদেশের ন্যাশনাল এ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস্ (National Academy of Sciences), ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটী (Indian Physical Society), [illegible]

Institute of Sciences of India) উল্লেখযোগ্য—প্রথমটির তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি এবং অপর দুইটির তিনি সভাপতি হন।

ডাঃ সাহার কার্য কেবল বিজ্ঞান-আলোচনায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি জাতীয় কল্যাণের নিমিত্ত কার্য্যকরী বিজ্ঞানেরও গবেষণা করিতেন। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ডাঃ সাহার ন্যায় নানা বিষয়ক আলোচনা অল্প লোকেই করিয়াছেন। সত্যই, ডাঃ সাহার জাগ্রত ও গ্রহিষ্ণু মন বর্তমান জগতের সমস্ত সমস্যাই যেন পরখ করিবার প্রয়াসী ছিল। স্বদেশের দৈন্য দূরীকরণে ডাঃ সাহার চিত্ত সর্বদাই উন্মুখ ছিল।

১৯৩৮ সালে ডাঃ সাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন এবং তখন হইতে তাঁহার কর্মসঙ্কুল জীবন আরো কর্মময় হইয়াছিল।

ডাঃ মেঘনাদ ভারতীয় বহু পরিকল্পনা সমিতির সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৯৫২ হইতে তিনি ভারতীয় লোকসভার সদস্যরূপে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, ১৯৫৮ সালে ডাঃ মেঘনাদ অকালে পরলোক গমন করেন।

ডাঃ নীলরতন ধর

যশোহর নগরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী ডাঃ নীলরতন ধর মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ধর যশোহরে বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময়েই সংসারে অনাকৃষ্ট থাকিতেন। এজন্য নীলরতনের মাতা স্বর্গীয়া নীরোদবাসিনী সংসারের সমস্তই নিজে দেখিতেন এবং অত্যন্ত নিপুণতার সহিত সংসার পরিচালনা করিতেন। ডাক্তার নীলরতন ভ্রাতা-ভগ্নীদিগের মধ্যে তৃতীয়, ইঁহারা ছয় ভ্রাতা ও তিন ভগিনী।

নীলরতন বাল্যাবস্থায় যশোহর জিলা স্কুলেই অধ্যয়ন করিতেন। সেখানে ক্লাসে বরাবরই উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তজ্জন্য প্রেসিডেন্সি বিভাগের ২৫৲ টাকা বৃত্তিও প্রাপ্ত হন। ১৯০৭ সালে তিনি কলিকাতায় রিপণ কলেজে আই-এস্ সি ক্লাসে ভর্তি হন। দুই বৎসর পরে ১৯০৯ সালে রিপণ কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ২০৲ টাকার বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

ইহার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং বি-এস্-সি পরীক্ষায় রসায়নে অনার্স লইয়া প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন; তজ্জন্য তিনি ৩২৲ টাকা বৃত্তি ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতেই নীলরতন আচার্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংশ্রবে আসেন ও তাঁহার প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হন।

১৯১৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে নীলরতন রসায়নে এম্-এস্সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সেই বৎসর এম-এ ও এম-এস্সিতে যত ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা

দিয়াছিল, তাহাদের সকলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য তাঁহাকে ৫০০৲ টাকার প্রাইজ ও কতকগুলি স্বর্ণপদক দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রাইজ তিনি পুস্তক আকারে গ্রহণ না করিয়া টাকায় গ্রহণ করেন এবং ঐ টাকার কিয়দংশ দিয়া তাঁহার এক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বন্ধুর এম-এস্‌সি পরীক্ষার কতিপয় পাঠ্য পুস্তক কিনিতে সাহায্য করেন। ইহা ব্যতীত গ্রিফিথ মেমোরিয়্যাল ও জুবিলী প্রাইজ এবং এশিয়াটিক সোসাইটীর "ইলিয়ট মেডেল" ও প্রাইজ পাইয়াছিলেন।

তারপরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজেই পালিত রিসার্চ স্কলারশিপ্ পাইয়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অধীনে রসায়নে গবেষণা-কার্য করিতে থাকেন। এম-এস্‌সি পরীক্ষাতেও গবেষণামূলক প্রবন্ধ দিয়াছিলেন।

এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া হইতে ষ্টেটস্ স্কলারশিপ প্রদত্ত হওয়ায় ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রসায়নের গবেষণা কার্যে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি বিলাত যাত্রা করেন।

সেখানে দেড় বৎসর কাল গবেষণা কার্য করিয়া মাত্র ২৫ বছর বয়সে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডক্টর অফ সায়েন্স" বা ডি-এস্‌সি পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। পরে ১৯১৯ সালে Fellow of the Institute of Chemistry of Great Britain and Ireland মনোনীত হন।

১৯১৭ সালে অক্টোবর মাসে প্যারিসের "ষ্টেট্-ডক্টরেটে"র জন্য ডাঃ নীলরতন প্যারিস গমন করেন। সেখানে এক বৎসর তিন মাস কাল মাত্র গবেষণা কার্য করিয়া ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে ২৭ বৎসর বয়সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবাসীর মুখ উজ্জল করেন। ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও অত্যন্ত অল্প বয়সে প্যারিসের ঐ ষ্টেট্-ডক্টরেট পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া প্যারিসের Saborne বা বিশ্ববিদ্যালয়ের

খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রফেসার উর্ব্বা (Urbain) ও প্রফেসার পেরাঁ (Perrin—ইনি নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্ত খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক) তাঁহাকে আজিও আদরের সহিত সম্বর্ধনা করিয়া থাকেন।

১৯১১ সালে ১৯ বৎসর বয়সে যে নবীন যুবা অদম্য উৎসাহে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, পরিণত বয়সেও তিনি সমান উৎসাহে ও উদ্যমে ঐ গবেষণা কার্য কেবল যে নিজেই করেন তাহা নহে, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক ছয়-সাতটি যুবককে প্রতি বৎসর গবেষণা কার্যে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করেন।

১৯১৯ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের প্রধান অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইয়া ডাঃ নীলরতন বিলাত হইতে ফিরিয়া জুলাই মাসে ঐ কার্যে নিযুক্ত হন।

এলাহাবাদে তাঁহার অধীনে রসায়নে :—

(১) ক্যাটালিসিস্; (২) কলোয়েড; (৩) বায়োকেমিষ্ট্রী ও (৪) আলোক-রশ্মির রসায়ন প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব—প্রধানতঃ এই চারি অংশে কার্য হয়। তাঁহার দুইখানি পুস্তক "Chemical Action of Light" ও "New Conceptions in Biochemistry" মিঃ ব্লাকি এণ্ড সন্স গ্লাসগো হইতে প্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার ও তাঁহার ছাত্রবৃন্দের প্রায় ২৫০ শত গবেষণামূলক প্রবন্ধ "জর্ণ্যাল অফ্ ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটী", "জর্ণ্যাল অফ্ ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রি", "কলোয়েড্ জাইশ্রিষ্ট্", "জাইশ্রিষ্ট্ ফর্ ফিজিক্যাল, ইন্-অর্গানিক এণ্ড বায়ো-কেমিষ্ট্রী" ইত্যাদি কতিপয় পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। এখনও নিয়মিত ভাবে নব নব প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। তাঁহার শিক্ষাধীনে কাজ করিয়া প্রথম আট বৎসরে ছাত্রদের মধ্যে যাহারা ডি-এস্‌সি পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম যথাক্রমে :—

১। ডাঃ শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল চাটার্জি—১৯২৩ সালে; একণে কাণপুরে অয়েল কেমিষ্ট। ডাঃ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র সেন—১৯২৫ সালে; একণে মুক্তেশ্বরের

ভেটিন্যারী ইন্‌ষ্টিটিউটে বায়োকেমিষ্ট। ৩। ডাঃ শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র চাটার্জি ১৯২৬ সালে; এক্ষণে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক। ৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যেশ্বর ঘোষ—১৯২৬ সালে, এক্ষণে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত। ৫। ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র মুখার্জি—১৯২৭ সালে; এক্ষণে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত। ৬। ডাঃ সি, সি, পালিত—১৯২৮ সালে, এক্ষণে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত। ৭।৮। ডাঃ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য—১৯৩০ সালে; ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ ১৯৩১ সালে; উভয়েই এক্ষণে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত।

গত ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসে (বঙ্গাব্দ ১৩২৭ সালের শ্রাবণ মাসে) স্বীয় ছাত্রী ও স্বর্গীয় ডাক্তার পরেশরঞ্জন রায়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী শীলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার সহধর্মিণীও তাঁহার সহিত রসায়নের গবেষণা কার্যে নিযুক্তা। শ্রীযুক্তা শীলাদেবী এম্‌-এস্‌'স পরীক্ষায় রসায়নশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

ডাঃ নীলরতন স্ত্রী-শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী। এলাহাবাদে বাঙালী মেয়েদের শিক্ষার জন্য "জগত্তারণ বালিকা বিদ্যালয়" (হাইস্কুল) স্থাপনে তিনিই অগ্রণী ছিলেন।

বিজ্ঞান-জগতে যশঃ ও খ্যাতি লাভ করিয়াও ডাঃ নীলরতন সংসারে ছোট-বড় সকলের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা সমভাবেই অটুট ও দৃঢ় রাখিয়াছেন। পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর জীবিতাবস্থায় সর্বদাই তাঁহাদের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। সাধ্যের অতিরিক্ত যত্নে ছোট ভাই-ভগিনীদিগকে মানুষ করিয়াছেন। দ্বিতীয় ভগ্নীর বিবাহে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাপ্ত স্বর্ণ-পদকগুলি ভাঙ্গাইয়া তিনি ভগ্নীর বিবাহের গহনা গড়াইয়া দেন। তৃতীয় ভগ্নীর বিবাহ নিজ ব্যয়ে সম্পন্ন করাইয়া ভগ্নীপতি ও চতুর্থ ভ্রাতাকে বিলাত হইতে সুশিক্ষিত করিয়া আনেন। পঞ্চম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার শিক্ষার সমস্ত ভারই নিজে বহন করিয়াছেন।

ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ কেবলমাত্র অধ্যাপক-ছাত্রের সম্পর্ক নহে। তিনি একাধারে তাহাদের গুরু, বন্ধু ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনিও তাহাদের স্নেহ করেন ও ভালবাসেন, তাহারাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে, সমস্ত বিষয়ে তাঁহার নিকট নিঃশঙ্কচিত্তে পরামর্শ গ্রহণ করে।

ইহা ব্যতীত বন্ধু-বান্ধব, নিঃস্ব ছাত্রবৃন্দ ও দীন-দরিদ্র তাঁহার নিকট সাহায্য ও সহানুভূতি চাহিয়া কখনও বিমুখ হয় নাই। নিজগুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া আচার্যদেবের জীবনের শুধু যে গবেষণা কার্যে উৎসাহ ও আগ্রহের উৎস নিজ জীবনে পাইয়াছেন তাহাই নহে, বাল্যাবস্থায় স্ফুটনোন্মুখ দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য ও পরকে সহানুভূতি ও সহায়তা দান—আচার্যদেবের এ বৃত্তিগুলি তাঁহাতে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে।

"বড় হ'তে হলে সব দিক থেকেই বড় হওয়া দরকার"—এই কথাটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যেমন সুন্দর ভাবে নিজের জীবনে দেখাইয়াছেন, তেমনই নিজ ছাত্রদের জীবনেও এই কথাটি খুব স্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

১৯২৬ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ও গটিঙ্গেনে এবং ১৯৩১ সালে এডিনবরায় তিনি তাঁহার গবেষণা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ডাক্তার ধর কৃষি সম্বন্ধে এবং গুড়ের সাররূপে ব্যবহারের বিষয়ে বিশেষ কার্যকরী গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহারই অর্থে এই নিমিত্ত একটি বীক্ষণাগার এলাহাবাদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

পূজনীয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার যে সকল প্রিয় শিষ্য রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা জীবনের ব্রত করিয়াছেন, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি দীর্ঘকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রেব প্রধান অধ্যাপক ও বাঙ্গালোর ভারতীয় সাঁয়েন্স ইনষ্টিটিউট্-এর ডিরেক্টর রূপে ভারতের বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

১৮৯৪ সালে ১৪ই সেপ্টেম্বব পুরুলিয়া সহরে ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পৈত্রিক নিবাস হুগলী জেলার আলম-বাটী গ্রামে। তাঁহাব পিতা ৺রামচন্দ্র ঘোষ কণ্ট্রাক্টর এবং অভ্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। সেজন্য সপরিবারে তিনি সাধারণতঃ ছোটনাগ-পুরের বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেন। ১৯০৩ সালে জ্ঞানচন্দ্র গিরিডি স্কুলে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন। কার্য উপলক্ষে তাঁহার পিতা অনেক সময়ই ছোটনাগপুরের জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামসমূহে থাকিতেন। সেজন্য স্কুলের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক আশুতোষ আইচ মহাশয় বালকের তত্ত্বাবধান করিতেন। গিরিডি স্কুলে বুদ্ধিমান্ ও সদাচারী ছাত্র হিসাবে জ্ঞানচন্দ্রের খুবই খ্যাতি ছিল। ছয় বৎসর গিরিডি স্কুলে অধ্যয়ন কালে তিনি পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়েই সর্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৯ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ছোট-নাগপুর ডিভিসন হইতে প্রথম স্থান লাভ করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আই-এস্‌সি পড়িতে আসেন। এইখানে নিজের মেধার গুণে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৬ বৎসরের তরুণ যুবক প্রায়ই সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধ আচার্যের সহিত কলিকাতায় গড়ের মাঠে দুই-তিন ঘণ্টা বেড়াইতেন এবং তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসামান্য কৃষ্টির রসাস্বাদ করিতেন। এই সাহচর্যই জ্ঞানচন্দ্রের
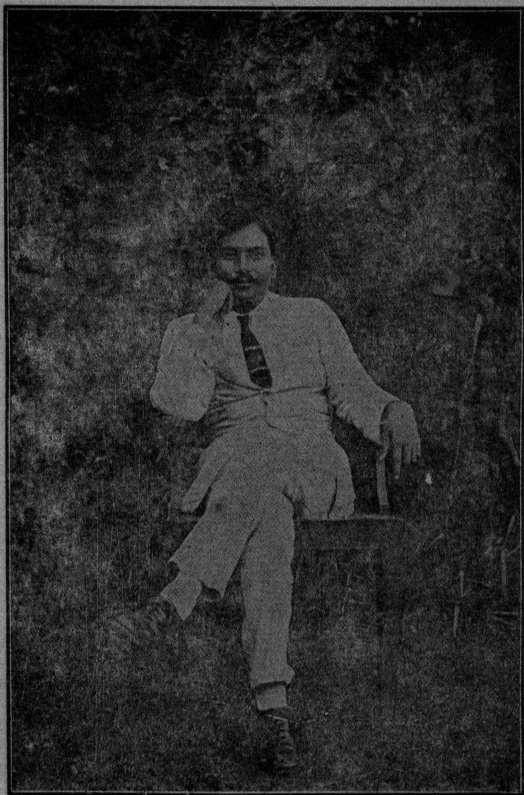
ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিল। ১৯১১ সালে আই. এস্-সি. পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া তিনি ২৫৲ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইলেন ও বি. এস্-সিতে কেমিষ্ট্রীতে অনার্স পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার অকাল মৃত্যুতে ঋণজালে জড়িত পরিবারবর্গের অশেষ দুর্গতি হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ সহৃদয় মিঃ জেমস্ এই দুঃসংবাদ জানিতে পারিয়া জ্ঞানচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠান ও ২৫৲ টাকা বৃত্তিতে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়া সম্ভব নয় বুঝিয়া তাঁহাকে বি. এস্-সি. ক্লাসে অর্ধ বেতনে পড়াশুনার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই অযাচিত দানের মর্যাদা জ্ঞানচন্দ্র রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ১৯১৩ সালের বি. এস্ সি. পরীক্ষায় কেমিষ্ট্রী অনার্সে প্রথম বিভাগে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ৪০৲ টাকা বৃত্তি ও অনেকগুলি স্বর্ণ-পদক পুরস্কার পান এবং ১৯১৫ সালে এম-এস্-সি. পরীক্ষায় রসায়ন শাস্ত্রের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-শাস্ত্রের পরীক্ষায় তাঁহার মত বেশী নম্বর আর কেহ পান নাই।

১৯১৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যনিয়ন্তা স্যর আশুতোষ রসায়ন বিভাগে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাস খুলিলেন। ২০শে আগষ্ট মাত্র এম্. এস্-সি. পরীক্ষা শেষ হইয়াছে; গুণগ্রাহী স্যর আশুতোষ তাহার তিন চারি দিন পরেই জ্ঞানচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং এম. এস্-সি. পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইবার বহু পূর্বেই জ্ঞানচন্দ্রকে এম্. এস্-সি. ক্লাসে রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যাপনা করিবার জন্য নিয়োগ-পত্র দিলেন। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে তিনি প্রায় সাড়ে তিন বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই সময় লবণাক্ত জলের (Salt Solution) গুণাবলী সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণা করিয়া তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধগুলি লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির মাসিক পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ সালে জ্ঞানচন্দ্র ৪৫০০৲ টাকা মূল্যের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান ও তাহার কিছুদিন পরেই ডি. এস্-সি উপাধি পান। এই সময়ে স্যর ফিলিপ হার্টগের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নির্দেশ করিবার জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হয় মিঃ হার্টগ তাঁহার অন্যতম সভ্য ছিলেন। তিনি যৌবনে মাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-শাস্ত্রেব অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ পরিদর্শন কালে জ্ঞানচন্দ্রের মৌলিক প্রবন্ধগুলি তিনি পাঠ করিয়া চমৎকৃত হন এবং স্যর আশুতোষকে অনুরোধ করেন যেন জ্ঞানচন্দ্রকে সত্বর য়ুরোপে পাঠান হয়। মহাযুদ্ধ অবসান হইবার পরই স্যর আশুতোষ জ্ঞানচন্দ্রকে য়ুরোপ যাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স-এ তিনি কিছুদিন গবেষণা করেন ও ঐ কলেজের সেমিনারে বক্তৃতা করিয়া তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। ১৯২১ সালের প্রারম্ভে তিনি বার্লিন যান। তথাকার বিশ্ববিখ্যাত প্রফেসর নার্নষ্ট ডাঃ ঘোষের গবেষণা সম্বন্ধে জার্মান ভাষায় একটি বক্তৃতা দেন। এবং প্রফেসর হাবার ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত ডাঃ ঘোষের প্রবন্ধগুলির একটি সংক্ষিপ্ত-সার জার্মান ভাষায় ছাপাইয়া দেন। ডাঃ ঘোষ লবণাক্ত জলের গুণাবলীর মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্তী গবেষণাকারিগণ তাহার কতক পরিমাণে পরিবর্তন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—লবণের প্রত্যেক পরমাণু জলের সংযোগে দুই ভাগে সম্পূর্ণরূপে বিভক্ত হইয়া যায়, একটি ভাগ ধনাত্মক বিদ্যুৎ-কণা ও অপর ভাগটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-কণা বহন করে—ইহা এখন সর্ববাদিসম্মত।

১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে স্যর ফিলিপ হার্টগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার হইয়া ভারতবর্ষে আসেন এবং ঐ বৎসর জুলাই মাসে ডাঃ ঘোষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-মন্দিরে তিনি

জড়-পদার্থের উপর আলোক-রশ্মির প্রভাব বিষয়ে অনেক মূল্যবান্ গবেষণা করিয়াছেন। ১৯২৫ সালে ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসে তিনি রসায়ন শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন এবং কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ সভার অধিবেশনে এই বিষয়ে তাঁহার মৌলিক গবেষণাগুলির একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার আধুনিক গবেষণা সম্বন্ধে দুইটি অধরচন্দ্র মুখার্জি মেমোরিয়াল বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন এবং পর বৎসরই জার্মানীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকার (Jahrbuch der Wissens-chaftliche Botanik) সম্পাদক উদ্ভিদশরীরে, বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড কিরূপে আলোক-সংযোগে শ্বেতসারে পরিণত হয় সে বিষয়ে তাঁহার একটি মৌলিক প্রবন্ধ তাঁহাকে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়া ছাপাইবার বন্দোবস্ত করেন। ডাঃ ঘোষের তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক বিভাগে মেধাবী ছাত্রদের মৌলিক গবেষণা করিবার স্পৃহা খুবই বলবতী হইয়াছিল। ডাঃ ঘোষের অধীনে কাজ করিয়া তাঁহার পাঁচজন ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্-সি. উপাধি পাইয়াছেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের হিন্দু হোষ্টেলে অবস্থানকালে ডাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু মিলিত হইয়া একটি ক্লাব স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পূজার ছুটীতে তাঁহারা সকলে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া একত্র বাস ও অধ্যয়ন করিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, ডাঃ পুলিনবিহারী সরকার ও বম্বে ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরেণুপদ কর এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন। সুখের বিষয় এই ক্লাবের সকল সভ্যই আজ স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল।

১৯৩১ সাল হইতে তিনি ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ-এর সভ্য নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর তিনি

ইণ্ডিয়ান রিসার্চ এসোসিয়েশনের (I. R. F. A.) মন্ত্রণাপরিষদের সভ্য ছিলেন। তিনি জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটির (Indian National Planning Committee) এবং যুক্ত বঙ্গের বাংলার শিল্প পরিকল্পনা কমিটির সভ্য হন। সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-বিভাগ ও ঢাকা হলের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত থাকিয়া ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে ডাঃ ঘোষ সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালোর সায়েন্স এসোসিয়েশনের ডিরেক্টার নিযুক্ত হন। ইহার পর তিনি ভারত সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার এবং খড়্গপুর হিজলীতে বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেক্‌নলজির ডিরেক্টার নিযুক্ত হন। এখানে শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার যে বিরাট আয়োজন হইয়াছে, উহার সুযোগ্য কর্ণধার ডাঃ ঘোষ উহাকে সফল করিয়া তুলিয়াছেন।

১৯৫৯ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৩০০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশেষ কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি কিছুদিন বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, পরে বিচার-বিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করেন।

পাঠ্যাবস্থায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহাব সহপাঠিগণের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী কালে বৈজ্ঞানিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রনাথেব সতীর্থ ছিলেন। ইঁহাদের অনেকেই বর্তমানে ভারতবর্ষেব বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের কর্তৃত্বভার লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রথম হইতে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

সে সময়ে লোকের ধারণা ছিল যে, বাঙালী ছাত্র শুধু কৃতিত্বের সঙ্গে বিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন; আচার্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র ভিন্ন আর কোন বাঙালী যে মৌলিক গবেষণায় খ্যাতি লাভ করিতে পারেন, এ ধারণা তখন সাধারণের ছিল না।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই প্রথম এদেশে রাসায়নিক গবেষণার সূত্রপাত করেন। বিশ বৎসরের উপর প্রফুল্লচন্দ্র নানা বাধাবিপত্তি ঠেলিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নাগারে মৌলিক গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ক্রমে ক্রমে এদেশে রসায়ন-চর্চা প্রচার হইতেছিল। এদিকে গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকায় ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রি অর্থাৎ পদার্থতত্ত্বমূলক

রসায়ন নামক একটি নূতন শাস্ত্র গড়িয়া উঠিতেছিল ; তখন পর্যন্ত ভারতবর্ষে এ শাস্ত্রের চর্চা মোটেই হয় নাই বলা যাইতে পারে। প্রফুল্লচন্দ্রের তিনটি ছাত্র—নীলরতন ধর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এই নূতন শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন এবং ইঁহারাই সর্বপ্রথম এ বিষয়ের চর্চা আরম্ভ করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ যে নূতন বিষয় অবলম্বন করিয়া গবেষণা আরম্ভ করেন, তাহার নাম "কোলয়ড (Colloid) রসায়ন"।

চিনি, লবণ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ জলের সঙ্গে সর্বতোভাবে মিশিয়া যায়, তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য ফ্যাণ্টহফ্, অষ্টওয়াল্ড প্রভৃতি খ্যাতনামা রাসায়নিকগণ পূর্বেই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গঁদ, শিরীষ, শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ জলে গুলিলে যে শ্রেণীর তরল পদার্থের উদ্ভব হয় তাহাদের স্বভাব-ধর্ম পূর্ববর্ণিত পদার্থগুলির সঙ্গে খাপ খায় না। অনেক দিন পূর্বে ইংরাজ রাসায়নিক গ্রেহাম এই শ্রেণীর পদার্থের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করিয়া ইহাদের "কোলয়ড" নামকরণ করেন। ভারতবর্ষে এবং সম্ভবতঃ প্রাচ্যদেশে অতি অল্প লোকেই সে সময়ে কোলয়ড রসায়নের খবর রাখিতেন, গবেষণার কথা ত স্বতন্ত্র। জ্ঞানেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এ দেশে কোলয়ড রসায়নের গবেষণার সূত্রপাত করেন। সকল দিক্ দিয়াই রসায়নের এই বিভাগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়। জীব শরীরে যে সকল জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে প্রাণশক্তির প্রকাশ বাহ্যতঃ পরিস্ফুট হয়, তাহাদের আলোচনা করিতে গেলে কোলয়ডের স্বভাব-ধর্ম সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক, কারণ জীব ও উদ্ভিদের দেহের অনেক পদার্থ কোলয়ডধর্মী। শারীর-তত্ত্ব-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোলয়ড রসায়নের সঙ্গে ইহার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। কার্যকরী বিজ্ঞানের দিক্ দিয়াও দেখা যাইতেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোলয়ডের সম্বন্ধ অতি

ঘনিষ্ঠ। সাবান, নানা প্রকারের রঞ্জন দ্রব্য, কৃত্রিম রেশম, রবার প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত করিবার সময় রাসায়নিককে কোলয়ড লইয়াই কারবার করিতে হয়।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট শ্রেণীর কোলয়ডের প্রকৃতি সংক্রান্ত অনেকগুলি গবেষণা করিয়াছেন। তরল কোলয়ডের মধ্যে দ্রবীভূত পদার্থের যে সকল "সংহতি" অবস্থান করে, নানা সূক্ষ্ম পরীক্ষার ফলে প্রমাণ হইয়াছে তাহারা তড়িৎ-সম্পন্ন। কোলয়ডের মধ্যে এই তড়িতের উদ্ভব একটি সমস্যা; এ সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ কোন জটিল প্রশ্ন উঠিলে, সমাধানের জন্য বিলাত ও অন্যান্য সভ্যদেশে মাঝে মাঝে বিশেষ সভা-সমিতি আহূত হইয়া থাকে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর তারিখে, বিলাতের ফ্যারাডে সোসাইটি ও ফিজিক্যাল সোসাইটি উদ্যোগী হইয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে পণ্ডিতবর্গকে আমন্ত্রণ করেন। এই সভায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ কোলয়ডের প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ এক মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সম্বন্ধে বিলাতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকা "নেচার" (Nature) ৪ঠা নভেম্বর তারিখে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন—

"সমগ্র আলোচনার মধ্যে জ্ঞানেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহাই সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ প্রবন্ধ।"

পরে নেচার এইরূপ মতও প্রকাশ করেন যে, জ্ঞানেন্দ্রনাথের মতবাদের সাহায্যে কোলয়ড সংক্রান্ত অনেক জটিল সমস্যার সন্তোষ-জনক সমাধান হইবে।

সহকর্মীগণের সহযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের রসায়নাগার হইতে জ্ঞানেন্দ্রনাথ অনেকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ ইংলণ্ডীয়, আমেরিকান, জর্মন ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকগণ এই

সকল প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কোলয়ড রসায়নে বিশেষজ্ঞ ফ্রয়েণ্ডলিক (Freundlich), জিগ্‌মণ্ডী (Zsigmondy) প্রমুখ জর্মন পণ্ডিতগণ তাঁহাদের রচিত প্রামাণিক গ্রন্থে জ্ঞানেন্দ্রনাথের গবেষণাকে বিশেষ স্থান দিয়াছেন। জিগ্‌মণ্ডী (নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন) তাঁহার গ্রন্থে কোলয়ডের তড়িদ্ধর্ম প্রসঙ্গে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "ফ্রয়েণ্ডলিক, ফ্যায়ন্সে (Fajans), মিকাইলিস্ (Michaelis) এবং মুখার্জি এই কয় জনের গবেষণা ভিন্ন কোলয়ডের অনেক স্বভাবধর্ম অজ্ঞাত থাকিত।"

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ ১৯২৯ সালের মাদ্রাজ অধিবেশনের রসায়নশাখার নেতৃত্ব করিবার ভার জ্ঞানেন্দ্রনাথের উপর অর্পণ করেন। এই উপলক্ষে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন সেরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ বিজ্ঞান কংগ্রেসে অতি অল্পই পঠিত হইয়াছে। এই অভিভাষণেব সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে "নেচার" নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করে

"অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষে কোলয়ড রসায়নের সর্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; তিনি এবং তাঁহার বহুসংখ্যক সহকর্মী যে মূল্যবান্ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন তাহাতে তাঁহার খ্যাতি সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। * * * * * গত বিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক আলোচনা যে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে, সমগ্র অভিভাষণই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। * * * * * একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর যে কোন অংশে বৈজ্ঞানিকগণ এই মূল্যবান্ অভিভাষণ মনোযোগ সহকারে শুনিতেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার সহকর্মিগণ কয়েক বৎসরের মধ্যে যে বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রমাণ হয় যে, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোলয়ড রসায়ন চর্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছেন।"

বিলাতে অবস্থান কালে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বন্ধুবর্গ এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বিশেষ ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় রাসায়নিককে মৌলিক অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশ করিবার জন্য বিদেশী পত্রিকার আশ্রয় লইতে হইত। ভারতবাসীদের পরিচালিত কোন রাসায়নিক পত্রিকা তখন আমাদের দেশে ছিল না। দেশের পক্ষে ইহা এক মহাকলঙ্কের কথা। জাপান, চীন প্রভৃতি প্রাচ্য-দেশেও পূর্ব হইতেই দেশীয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকা চলিতেছিল। এই কলঙ্ক মোচনের উদ্দেশ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ উদ্যোগী হইয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় রসায়ন সভার প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রথম চারি বৎসর ইহার অবৈতনিক সম্পাদকের কার্য করেন। দেশবাসী ও বিদেশীয়-দের মধ্যে অনেকেই এই প্রচার সমিতি প্রতিষ্ঠার সময়োপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিগত কতিপয় বৎসরের মধ্যে ভারতীয় রসায়ন সভা ও তৎসম্পর্কিত পত্রিকা যে সগৌরবে বিজ্ঞান রাজ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে, এই সাফল্যের বড় কম অংশের কৃতিত্ব জ্ঞানেন্দ্রনাথের প্রাপ্য নহে। বস্তুতঃ প্রথম কয় বৎসর জ্ঞানেন্দ্রনাথের সাহায্য ও উৎসাহ না পাইলে সমিতির বর্তমান অবস্থায় আসা সম্ভবপর হইত না। জ্ঞানেন্দ্রনাথ পরে ইহার অন্যতম সহকারী সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং দুই জন পত্রিকাধ্যক্ষের তিনি অন্যতম ছিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথের অনেক কৃতী ছাত্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও রাসায়নিকের পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তাঁহার কতিপয় ছাত্র বিদেশে গিয়া যশ অর্জন করিয়াছেন।

ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী

স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্রের মধ্যে যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীনতম হইলেন ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী। ইনি আবার প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁহারই শূন্য অধ্যাপক পদ ১৯২৫ সাল হইতে অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং ঐ কলেজের রসায়ন বিভাগের গবেষণার সুনাম রক্ষা করিয়াছেন।

ডাঃ নিয়োগী ইংরাজী ১৮৮৩ সালে ৪ঠা অক্টোবর তারিখে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী হোয়েড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺শশিভূষণ নিয়োগী কলিকাতার ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রেসের গেজেট বিভাগের সেক্‌সন্ হোল্ডার ছিলেন। তাঁহার বেতন বেশী ছিল না, কায়ক্লেশে তাঁহার সংসার চলিত। বাল্যকালে তিনি স্বগ্রামের মাইনর স্কুলে মাইনর ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়া এগার বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলিকাতায় আসেন এবং আর্য মিশন স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন।

এই স্কুলেই বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সহিত তাঁহার চাক্ষুষ পরিচয় হইবার সুযোগ ঘটে।

এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া পনের টাকার সরকারী বৃত্তি পান এবং ডাফ্ কলেজের এফ্. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। সেখানেও তিনি ওয়াট্, টম্‌সন্ প্রভৃতি অধ্যাপকদিগের প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং এফ্. এ. পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কুড়ি টাকা সরকারী বৃত্তি পান। ঐ পরীক্ষায় রসায়ন-শাস্ত্রে বিশ্ববিত্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সারদাপ্রসাদ প্রাইজ পান, এবং সেই অবধি কলিকাতায় বিশ্ববিত্যালয়ের যতগুলি পরীক্ষা দিয়াছেন, সকলগুলিতেই রসায়ন-শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এফ্. এ, পাশ করিয়া তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সী

কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। তখনকার দিনে বিজ্ঞানের জন্য বি এস্. সি. ক্লাসের সৃষ্টি হয় নাই। বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য বি. এ. পরীক্ষায় বি. কোর্স ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইবার প্রধান কারণ ছিল—তিনি ডাক্তার জগদীশ বসু ও ডাক্তার পি. সি. রায়ের নিকট বিজ্ঞান পড়িবেন। কিন্তু ডাক্তার বসু সেই বৎসর বিলাতে চলিয়া গেলেন এবং ডাক্তার রায় বি. এ. ক্লাসের থার্ড ইয়ারে পড়াইতেন না। যুবক পঞ্চানন প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ট্রান্স্ফার লইয়া আসিয়া বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হইলেন এবং দুই বৎসরকাল প্রত্যহ কলেজের পর বৈকালে সায়েন্স এসোসিয়েশানে গিয়া পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রের বক্তৃতা শুনিতেন ও প্রাকৃটিক্যাল্ করিতেন। তিনি মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে ১৯০৩ সালে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রের অনার্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং উড্রো বৃত্তি, গঙ্গাপ্রসাদ সুবর্ণ পদক ও রায় অমৃতলাল মিত্র বাহাদুর পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। কলেজে পড়িবার কালে তাঁহার পিতা তাঁহার মাতাঠাকুরাণীকে কলিকাতায় আনয়ন করেন এবং তাঁহারা কাঁসারি-পাড়ায় ৭।৮ টাকা বাড়ীভাড়া দিয়া দুইখানি ঘরে বাস করিতেন। পঞ্চানন বরাবরই সরকারী বৃত্তি পাইয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার কলেজে পড়াশুনা হইয়াছিল, নচেৎ হইত না।

বি. এ. পাশ করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আবার ভর্তি হন এবং ১৯০৪ সালে এম্. এ. পরীক্ষায় রসায়ন-শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং একশত টাকার সরকারী গবেষণা-বৃত্তি (Research Scholarship) প্রাপ্ত হন। দুই বৎসর ডাঃ পি. সি. রায়ের নিকট ঐ কাজ করিয়া তিনি ১৯০৬ সালে গবেষণার জন্য গ্রিফিথ্স মেমোরিয়েল প্রাইজ এবং ঐ বৎসরেই রসায়ন-শাস্ত্রে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। সে সময় ঐ বৃত্তির মূল্য ছিল আট হাজার টাকা এবং এখনকার মত উহা কেবল মাত্র গবেষণা

বৃত্তি ছিল না। এম্‌. এ. উপাধিধারীদের মধ্যে যিনি যে বিষয়ে ভাল তিনি সেই বিষয়ে পরীক্ষা দিতেন এবং সকলের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন তিনিই ঐ বৃত্তি পাইতেন এবং তাঁহাকে গবেষণাও করিতে হইত। ডাঃ নিয়োগীর পরীক্ষকগণ ষোল দিন তাঁহার প্রাকৃটিক্যাল পরীক্ষা লইয়াছিলেন। এই ষোল দিন সমস্ত দিবস দাঁড়াইয়া থাকাতে তাঁহার পা ফুলিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তারপর পরীক্ষকগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সেই জন্য তখনকার দিনের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিকে Blue Ribbon of the University বলিত। এরূপ কঠোর পরীক্ষা দিয়া স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, স্যর যদুনাথ সরকার, ই. এম. হুইলার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীগণ ঐ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই পরীক্ষার উগ্র ও আয়ুক্ষয়কারী কঠোরতা দর্শনে ও গবেষণার উন্নতির জন্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার থাকাকালে ঐ পরীক্ষা উঠাইয়া দিয়া উহাকে প্রতিযোগিতামূলক গবেষণা বৃত্তিরূপে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে ডাঃ নিয়োগীর দারুণ সাংসারিক বিপদ ঘটে। তাঁহার পিতৃদেব তাঁহার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্তির তিন মাস পূর্বে চারি পাঁচ দিনের জ্বরে ইহলোক ত্যাগ করেন।

রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইবার পর তিনি কর্মের সন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন বঙ্গভঙ্গ (Partition of Bengal) সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ ও আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশ হইয়াছে। হঠাৎ একদিন পূর্ববঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার সার্প সাহেবের নিকট হইতে ২৫০৲ টাকা মাহিনায় রাজসাহী কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইয়া একখানা টেলিগ্রাফ আসিল। তিনি ১৯০৭ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মফঃস্বল কলেজেও রাসায়নিক গবেষণা যে সম্ভবপর তাহা ডাঃ নিয়োগী প্রথম সপ্রমাণ করেন।

ডাঃ নিয়োগী রাজসাহী কলেজ হইতে জৈব নাইট্রাইট, নাইট্রো-প্যারাফিনস্ ও এ্যামিনস্ সম্বন্ধে অনেকগুলি রাসায়নিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত করেন।

ডাঃ নিয়োগী রাজসাহীতে চৌদ্দ বৎসর ছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৯২০ সালে ইম্পিরিয়াল সার্ভিস (Indian Educational Service)-এ উন্নীত হন। ১৯২১ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলী হন। সেখানে মাত্র মাস চারেক থাকার পর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। সেখানে তাঁহাকে চারি বৎসর কাল থাকিতে হয়। পরে ১৯২৫ সালে তিনি তাঁহার চির-ঈপ্সিত প্রেসিডেন্সী কলেজে স্থায়ী ভাবে বদলী হন।

রাজসাহী কলেজে থাকিবার কালে তিনি সাধারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়া আরও নানা লোকহিতকর বৈজ্ঞানিক কার্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার কতক কতক গবেষণার পরিচয় এখানে প্রদত্ত হইল।

(১) প্রাচীন ভারতের ধাতুশিল্প জ্ঞানের (Metallurgy) পরিচয় পাইবার জন্য আট দশ বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং অনেক অনুসন্ধানের ফলে Iron in Ancient India এবং Copper in Ancient India নামক পুস্তকদ্বয় লিখিয়াছিলেন। প্রথম পুস্তকখানি ১৯১৬ সালে ও দ্বিতীয়খানি ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁহার পুরাতন শিক্ষায়তন Indian Association for the Cultivation of Science পুস্তক দুইখানি প্রকাশিত করেন এবং পুস্তক দুইখানিই ভারতে ও বাহিরে সর্বত্র সমাদৃত হয়।

(২) আয়ুর্বেদীয় ধাতু-ঘটিত ঔষধে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া তিনি তাহার ফল 'আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন' নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। ইহাতেও তিনি ছয়-সাত বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অবস্থান কালে ডাঃ নিয়োগী ছাত্র-হিতকর আর একটি মহৎ কার্য সাধন করিয়াছিলেন - তাঁহারই উদ্যোগে ও উৎসাহে সেখানে একটি Training Corps গঠিত হয়।

প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া তিনি গবেষণায় মনোযোগ দিলেন। তিনি সেকালের পি. আর. এস্. ছিলেন বলিয়া জৈব, অজৈব ও পদার্থবিদ্যামূলক রসায়ন (Organic, Inorganic ও Physical Chemistry) এই তিন বিভাগেই তাঁহার কমবেশী অধিকার ছিল, এবং রসায়নের এই তিন বিভাগেই গবেষণা করিতে লাগিলেন। জৈব রসায়নের মধ্যে Stereo-chemistryতে তিনি বিশেষজ্ঞ এবং ঐ বিষয়ে তিনি এম্. এস্-সি ক্লাসে বক্তৃতা দেন। ঐ বিষয়ে তাঁহার অনেক আবিষ্কার আছে। কয়েকটির পরিচয় এখানে দেওয়া হইল—(১) Manganese Dioxide জলে রাখিয়া sulphur dioxide ফ্যালাইলে ম্যালিইক অম্ল প্রভৃতির Geometrical inversion হয় অথচ ঐ দ্রব্যগুলির কোনটি অথবা তাহাদের সংযোগে উৎপন্ন কোন দ্রব্যের দ্বারা inversion হয় না। ঐরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নাম দিয়াছেন Resonance Reactions। ক্লুপ এইরূপ একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ডাঃ নিয়োগীর এই আবিষ্কার ঐ শ্রেণীর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় উদাহরণ। (২) ইহা ছাড়া তিনি Geometrical Inversionএর যে নূতন থিওরী আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা ১৯৩০ সালের ৩০শে আগষ্ট তারিখের বিলাতের কেমিক্যাল্ নিউজ (Chemical News) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্বে উইসিলিসেনাস, ষ্টিউয়ার্ট, কোহেন প্রভৃতি যে থিওরী দিয়াছিলেন তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণিত হওয়াতে ডাঃ নিয়োগীর থিওরী উত্তরোত্তর প্রচলিত

হইতেছে। (৩) তাহা ভিন্ন যশদ (Zinc) ও ক্যাড্‌নিয়ম ধাতুদ্বারা যৌগিক ভাঙ্গিয়া ঐ দুই ধাতুর সর্বপ্রথম optically active যৌগিক আবিষ্কার করেন। পদার্থমূলক রসায়নে ডাঃ নিয়োগী রসায়ন প্রক্রিয়ার Period of Induction সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। মূলতঃ এ সম্বন্ধে ল্যাণ্ডোল্ট সাহেবের যে নিয়ম আছে তাহাই তাহার গবেষণায় সমর্থিত হইয়াছে।

ডাঃ নিয়োগীর অজৈব রসায়নে গবেষণা সর্বাপেক্ষা বেশী। তিনি এলুমিনিয়াম্ হাইড্রকসাইডের একটি দানাদার আকার-বিশিষ্ট স্বরূপ আবিষ্কার করেন। ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

তাহা ভিন্ন নূতন নূতন ডাইথায়োফস্‌ফেট্‌স্ (dithio phosphates), হাইপোনাইট্রাইট্‌স্ (hyponitrites) ও তাহাদের নূতন প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কার করেন। এতদ্ভিন্ন বহু Co-ordinated Inorganic Compoundsও তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন।

অজৈব রসায়নে ডাঃ নিয়োগীর সর্বপ্রধান আবিষ্কার নূতন গেলিয়াম যৌগিকসমূহ (New Compounds of Gallium)। এই গেলিয়াম ধাতুর আবিষ্কার-কাহিনী রসায়ন-শাস্ত্রের একটি পরম কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। সুপ্রসিদ্ধ মেণ্ডেলিয়েফ্ এই ধাতুর অস্তিত্ব গণনার দ্বারা সাব্যস্ত করেন এবং উহার নাম দেন 'এক-এলুমিনিয়াম।' রসায়নশাস্ত্রে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এই প্রথম। পরে লেকক্ ডি বই সর্বদা (Lecoq de Bois Bouider) সাহেব উহা আবিষ্কার করেন এবং উহার আধুনিক নাম গেলিয়াম রাখেন। কিন্তু ঐ ধাতুটি দুষ্প্রাপ্য বলিয়া উহার অধিকাংশ যৌগিকই অজ্ঞাত। ডাঃ নিয়োগী এই গেলিয়াম ধাতুর বহু যৌগিক আবিষ্কার করিয়াছেন এবং পোটাসিয়াম গেলিয়াম অক্‌সালেট্ (Potassium Gallium Oxalate)কে optically active যৌগিকে ভাঙ্গিতে সমর্থ

গবেষকরূপে স্যর উপেন্দ্রনাথের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। তিনি শিক্ষকতার কার্যভার গ্রহণ করিবার পর হইতেই কালা-আজর, ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন। রসায়ন-শাস্ত্রেও তাঁহার গবেষণার দাম কম নয়। তবে ইউরিয়া-ষ্টিবামিন (Urea-Stibamine) নামক কালা-আজরের প্রতিষেধক আবিষ্কারই তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবের। তাঁহাব রচিত "Treatise on Kala-Azar" এ সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থ। ডাঃ কার্ল মেনস্‌-এর জর্মন গ্রন্থে কালা-আজর সম্বন্ধে অধ্যায়টি স্যর উপেন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে লিখিয়াছিলেন।

স্যর উপেন্দ্রনাথ বহুবিধ বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৬ সালে ইন্দোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। 'রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিন'-এর তিনি সভ্য ছিলেন।

উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র তিরোহিত হইয়াছে। বিজ্ঞান যে লোক-কল্যাণের কত বড় বাহন হইতে পারে, স্যর উপেন্দ্রনাথ তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু

আচার্য জগদীশচন্দ্রের 'বোস ইনষ্টিটিউটের' (বসু-বিজ্ঞান-মন্দির) সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু ইংরেজি ১৮৮৫ সালের ২৬শে নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পৈতৃক নিবাস ময়মনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধি গ্রামে। ডাঃ দেবেন্দ্রমোহনের পিতার নাম স্বর্গীয় মোহিনীমোহন বসু।

ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন কলিকাতার সিটি স্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন।

এই কলেজ হইতে তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রে অনার্স সহ বি. এস্-সি. পাশ করেন। ইহার পর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পদার্থ-বিদ্যায় এম্. এ. পাশ করেন এবং প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেখানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়স্থ কেভেন্‌ডিশ্ লেবরেটারীতে অধ্যাপক জে. জে. টম্‌সনের তত্ত্বাবধানে গবেষণা-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তৎপর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ-বিদ্যায় অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন।

ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রতিষ্ঠিত রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ইউরোপে যান। তথায় বের্লিনস্থ রেগেনার্স্ লেবরেটারীতে রেডিও এ্যাকটিভিটির গবেষণা করিতে থাকেন এবং এই গবেষণাকালে তিনি বিজ্ঞানের ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। বের্লিনে অবস্থান কালে তিনি বহু তথ্যপূর্ণ গবেষণা করিয়াছিলেন। চুম্বকত্ব বিষয়ে তাঁহার গবেষণার ফলাফল দ্বারা বিদ্বজ্জনের মধ্যে ইনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

চুম্বকত্বের গবেষণার ফলে তিনি যে মতবাদ প্রকাশ করেন তাহা 'বোস-ষ্টোনার থিওরি' নামে পরিচিত।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন ভারতীয় বিজ্ঞান-মহাসভার লাহোর অধিবেশনে পদার্থ-বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র শাখার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ভোল্টা শতবার্ষিকী উপলক্ষে অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে তিনি ইটালী গমন করেন। ১৯৩৩ সালে ফ্যারাডে সোসাইটির আমন্ত্রণক্রমে পদার্থ-বিদ্যাবিদ্‌গণের সভায় যোগদান করিতে তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পালিত প্রফেসর অব ফিজিক্‌সের' পদে নিযুক্ত হন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর তিরোধানের পরে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষরূপে তিনি যোগদান করিয়াছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্রের তিনি যোগ্য প্রতিনিধি হইয়াছেন।
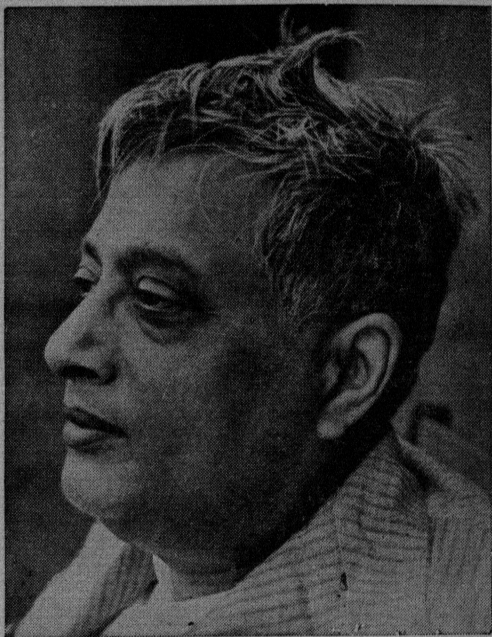
অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় ভারতীয়ের পক্ষেও যে অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সমকক্ষতা লাভ করা সম্ভবপর তাহার সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বিজ্ঞানের গবেষণা ভারতবর্ষে আরম্ভ হইয়াছে খুব বেশী দিনের কথা নয়, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়াও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভারতবর্ষের অগ্রগতি বাস্তবিকই গৌরবের বিষয় এবং এই গৌরবের জন্য যাঁহাদের সাধনা সব চেয়ে প্রশংসার যোগ্য অধ্যাপক বসু মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। অধ্যাপক বসু মহাশয় ইং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কলিকাতায় গোয়াবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় খুব উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি অন্যান্য বিষয়কার্যে লিপ্ত থাকিলেও বাংলা দেশে সর্বপ্রথম কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ওয়ার্কস বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের বহু পূর্বে স্থাপিত হয়। সত্যেন্দ্র-নাথের মাতা আমোদিনী দেবীর পিতা আলিপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ৺মতিলাল রায় চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতির সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ পাঁচ বৎসর বয়সে বাড়ীর নিকট নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে ভর্তি হইয়া প্রবেশিকা পর্যন্ত পাঠ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পীড়িত হইয়া পড়াতে দেওয়া হয় না। তখন তিনি হিন্দু স্কুলে এক বৎসর পড়েন এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা

শিক্ষক এবং সহপাঠীদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে তিনি শিক্ষকগণকেও বিস্মিত করেন। যিনি একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই আর তাঁহার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি কলেজের জীবনেই তাঁহার উদার চরিত্র এবং বহুমুখী প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে অধিকাংশের সঙ্গেই তিনি অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং পড়াশুনার অবসরে বহু সময় তিনি বন্ধুদের সঙ্গে অতিবাহিত করিতেন। পাঠ্য বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তিনি পড়াশুনা করিতেন।

তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান শুধু বিজ্ঞান ও গণিতেই সীমাবদ্ধ নয়, তিনি সাহিত্যে ও দর্শন সম্বন্ধেও যথেষ্ট পড়াশুনা করিতেন। ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, একজন পদার্থবিদ্ সংস্কৃত ও পারসী সাহিত্যেও অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই নানা দিক দিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার এম্. এস্-সি. পাশ করার বৎসর একটি স্মরণযোগ্য বৎসর বলা যাইতে পারে। কারণ সেবারে যাঁহারা এম্. এস্-সি. পাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পরে যত জন বিজ্ঞানের গবেষণায় যশস্বী হইয়াছেন, এইরূপ অন্য কোন বৎসরের উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে হয় নাই। এই সম্পর্কে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ডাঃ মেঘনাথ সাহা, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ পুলিনবিহারী সরকার, ডাঃ যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী, ডাঃ নিখিলরঞ্জন সেন, বরিশাল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ স্নেহময় দত্ত—ইঁহারা সকলেই সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। এইরূপ অসাধারণ প্রতিভাশালী ছাত্রসমূহের মধ্যেও তিনি কখনও কোন পরীক্ষায় প্রথম স্থান হইতে বিচ্যুত হন নাই।

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন বিজ্ঞান-কলেজ স্থাপন করেন, ইহা বাংলা দেশের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁহার মেধাবী সহপাঠিগণ ঠিক সেই সময়ে কলেজের পাঠ শেষ করিয়া বাহির হন। কাজেই উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব স্যর আশুতোষের অনুভব করিতে হয় নাই। সত্যেন্দ্রনাথ সেই সময়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের লেকচারার নিযুক্ত হন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার মনোনয়ন সম্বন্ধে স্যর আশুতোষ বিচক্ষণতার প্রমাণ দিতে থাকেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা এবং পদার্থ-বিজ্ঞানে দুরূহ বিষয়গুলির প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ বিজ্ঞান-কলেজের ছাত্রবৃন্দকে মুগ্ধ করে।

ইহার কিছুদিন পূর্বে আইনষ্টাইন তাঁহার "সাধারণ আপেক্ষিকতা বাদ" বিবৃত করেন। পদার্থ-বিজ্ঞানের এই নূতন চিন্তাধারা তাঁহার চিন্তাশীল মনে প্রেরণা জাগায় এবং ঐ বিষয়ে তাঁহার কয়েকটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ বাহির হয়। যে সময়ে এই অভিনব তত্ত্ব পৃথিবীর খুব অল্প সংখ্যক বৈজ্ঞানিকেরই বোধগম্য হইয়াছিল, সে সময়ে বাংলাদেশের দুই জন তরুণ বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ যে শুধু এ বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন তা নয়, এ বিষয়ে তাঁহারা গবেষণা করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহা বাস্তবিকই গৌরবের বিষয়। তাঁহারা দুই জনে আইনষ্টাইনের লিখিত প্রবন্ধগুলির একটি প্রাঞ্জল ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া জার্মান ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকদের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে রীডার হইয়া ঢাকায় আসেন এবং তাঁহার উচ্চাঙ্গের গবেষণা আগের মতই চলিতে থাকে।

ইলেক্ট্রনের গতিবিধি এবং আলো ও ইলেক্ট্রনের পরস্পরের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে এমন সমস্ত তথ্য পদার্থবিদ্‌গণ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবিষ্কার করিলেন, যাহা সাধারণ বলবিদ্যার মৌলিক নিয়মগুলির বিরুদ্ধাচরণ করে বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ইহাদিগকে নিয়ম-কানুনের মধ্যে আনিবার জন্য অনেক রকম চেষ্টা চলিতে লাগিল এবং কোন প্রকারেই তাহা সম্ভবপর হইতেছিল না। তখন কয়েকজন মনীষী চিন্তা করিলেন যে, বলবিদ্যার সাধারণ নিয়মগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে আমাদের সাধারণ বস্তুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া। কিন্তু পরমাণু ও ইলেক্ট্রনের আকার তাহা হইতে বহু গুণে ক্ষুদ্র। সুতরাং ইহারাও যে সাধারণ নিয়মাবলী মানিয়া চলিবে সেরূপ ধারণা করার কোনও কারণ নাই। তাই তাঁহারা নূতন নিয়মাবলী আবিষ্কারে লাগিয়া গেলেন এবং এ বিষয়ে অগ্রণী হইলেন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি আলোকণিকা সম্বন্ধে দেখাইলেন যে, সাধারণ পরিসংখ্যান প্রণালীর পরিবর্তে তাঁহার উদ্ভাবিত নূতন এক পরিসংখ্যান প্রণালী প্রয়োগ করা দরকার। আইনষ্টাইন প্রমাণ করিলেন যে, এই প্রণালীতে হিসাব করিলে আলো বিকীরণের নিয়ম-কানুনের মধ্যে কোন প্রকার অসঙ্গতি থাকে না। বিশ্বের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী সত্যেন্দ্রনাথের নামানুসারেই এই প্রণালীর নামকরণ করিলেন 'বসু পরিসংখ্যন'। তাঁহার এই আবিষ্কারের অল্প পরে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক ফার্মি এবং ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ডিরাক একই ধরণের চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া ইলেক্ট্রনের হিসাবের জন্য অন্য এক প্রকার পরিসংখ্যান প্রণালী আবিষ্কার করেন। আলোকণিকা এবং কয়েক প্রকারের বস্তু কণিকা যথা আলফা রশ্মি ও ভারী ইলেক্ট্রন প্রভৃতি বসু পরিসংখ্যা-নের নিয়ম মানে। এই দুইটি পরিসংখ্যান প্রণালীর উপর ভিত্তি করিয়া আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের সৌধ তৈয়ারী সম্ভবপর হইয়াছে। ইহা হইতেই ধারণা করা যাইতে পারে, বিজ্ঞান-জগতে সত্যেন্দ্রনাথের দান কত উচ্চস্তরের। তাঁহার এই আবিষ্কারে শুধু তাঁহার নয়, ভারতবর্ষের সম্মান বৈজ্ঞানিক মহলে অনেক উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু যিনি এই সম্মানের অধিকারী সেই আপন-ভোলা আড়ম্বরহীন মানুষটিকে দেখিলে মনে হয় না যে, তিনি সেই বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক।

ইহার পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ইউরোপে পাঠাইলেন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের জন্য। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তিনি এই প্রকারে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের সুযোগ লাভ কবেন। তাহা ছাড়া পরীক্ষামূলক পদার্থ-বিজ্ঞানেও মার্ক এবং মাদাম কুরীর ল্যাবরেটারীতে কাজ করিয়া তিনি দক্ষতা লাভ করেন। বিদেশে গবেষণা কালে তিনি সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই উচ্চ সম্মান ও সমাদর লাভ করেন। উচ্চ গণিতে তাঁহার অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি সকল পণ্ডিতেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল—এমন কি, তিনি যে সকল বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের সহিত গবেষণা করিতেন তাঁহারাও অনেক সময় জটিল গণিতের বিষয়ের সমাধানের জন্য সত্যেন্দ্রনাথের সাহায্যপ্রার্থী হইতেন। তিনি কোন বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিই গ্রহণ করেন নাই—কেউ এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সগর্বে উত্তর করিতেন, তাঁহার নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের পরিচয়, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীব প্রয়োজন নাই।

ইউরোপ হইতে দেশে ফিরিবার অল্প পরেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানে প্রফেসার নিযুক্ত হন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি বিজ্ঞানের ডীন্ হন। তাঁহার অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের দিকটা আশাতীত উন্নতি লাভ করে। পদার্থবিজ্ঞানের নূতন উদ্দীপনা আসে এবং নানাবিষয়ে উন্নত ধরণের গবেষণা চলিতে থাকে। প্রফেসার ও ডীনের কাজের দায়িত্ব তিনি যে ভাবে সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। ইহার পর তাঁহার উপর আরও একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পড়ে—তাহা ঢাকা হলের সর্বাধ্যক্ষত্ব (প্রভোস্ট)। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সে বিষয়ে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দেন। এইরূপ তিনটি দায়িত্বপূর্ণ পদের কার্য সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পাদন করা একমাত্র তাঁহার মত প্রতিভাশালী লোকের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিত্থালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অধ্যাপক বসু কলিকাতা বিশ্ববিত্থালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন। কলিকাতায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কর্মধারা বহুমুখী হইয়া পড়ে।

১৯৫২ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নিযুক্ত হন এবং বহু জনহিতকর কার্যের সঙ্গে যুক্ত হন।

ইহার পর তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিত্থালয়ের উপাচার্য (ভাইস্-চ্যান্সেলার) নিযুক্ত হন। ভারত সরকার তাঁহাকে 'ন্যাশনাল প্রফেসর' মনোনীত করিয়া তাঁহার প্রতিভার সম্মান দিয়াছেন।

এ পর্যন্ত তাঁহার বিত্থাবত্তার কথাই বলা হইল, কিন্তু চরিত্রের দিক দিয়াও তিনি অসাধারণ। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার সকলকেই সমানভাবে মুগ্ধ করে। ছোট বড় বলিয়া কোনও প্রভেদ তাঁহার নাই। তাঁহার ব্যবহারে এমন একটা সরলতা এবং সকলের প্রতি দরদ প্রকাশ পায় যাহাতে প্রত্যেকেরই শ্রদ্ধা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক সৌজন্য তাঁহার কর্তব্যে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না। তিনি যখন অঙ্ক কষিতে থাকেন অথবা কোন গভীর তথ্যে মনোনিবেশ করেন সেরূপ সময়ে তাঁহার ব্যবহার সম্বন্ধে সময় সময় ভুল ধারণা হয়। কিন্তু বাস্তবিক তখন তাঁহার মন অন্য জগতে, এ জগৎ সম্বন্ধে তখন তিনি অচেতন। এইরূপ অসাধারণ একাগ্রতা পুরাকালের মুনিঋষিদের সম্বন্ধেই শোনা যায়, এ যুগে ইহা দুষ্প্রাপ্য। বিনয় তাঁহার স্বভাবের শুধু ভূষণ নয়, স্বভাবের অঙ্গ। তাঁহার সরল ব্যবহারে ও কথাবার্তায় কখনও এ ধারণা আসে না যে, তিনিই বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ! সকল বিষয়ে অনাড়ম্বরতাই তাঁহার বিশেষত্ব—কি পোষাক-পরিচ্ছদে, কি কথাবার্তায়, কি লেখাতে। হাফসার্ট, ধুতি এবং স্যাণ্ডেল এই তাঁহার সাধারণ পোষাক। এই পোষাকে তিনি কোথায়ও যাইতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায়, একজোড়া স্যাণ্ডেল ও হাফসার্ট পরিহিত, এলোমেলো অবিন্যস্ত কেশে যখন তিনি চলাফেরা করেন, তখন একজন অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন যে, এই সরল অনাড়ম্বর ও উদাসীন ব্যক্তিটিই বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ।

তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্ হইলেও তাঁহার জ্ঞানসাধনার পরিধি এত গভীর ও বিস্তৃত যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের যে কোন বিভাগেরই হউক না কেন, যখন কোন্ গবেষণাকারী ছাত্র কোন জটিল সমস্যা সমাধান করিতে না পারেন, তখনই অধ্যাপক বসুর সাহায্য গ্রহণ করেন এবং তাহার তীক্ষ্ণ মেধা ও গভীর পাণ্ডিত্যের স্পর্শ লাভ করিয়া সকল জটিল তত্ত্ব সহজ ও সরল হইয়া পড়ে। মৌলিক গবেষণাকারী ছাত্রগণ তাঁহার নিকট না গেলেও তিনি নিজেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক-সুলভ অনুসন্ধিৎসা লইয়া সকলের খোঁজ-খবর করেন এবং সকলের নিকটে যাইয়াই তাহাদিগকে তাঁহার স্নেহকোমল মিষ্টভাষায় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেন।

সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ স্বদেশপ্রেমের কথা অনেকেই হয়তো জানেন না। তিনি মুখে বলার চেয়ে কাজে দেশভক্তি দেখাইবারই পক্ষপাতী বেশি। অনেক স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান তাঁহার নিকট হইতে নানা প্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করে। নানা প্রকার সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিষ যাহা আমাদের দেশে হয় না, তাহা তৈয়ারী-করা শিখিবার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ ও সুযোগ-সুবিধা তিনি অনেককেই করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার দয়ার কথাও তিনি যথাসাধ্য গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন। কাহারও কোন দুঃখকষ্ট দেখিলে তিনি সাধ্যানুরূপ সাহায্য দান করেন। অনেক ছাত্র ও অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁহার নিকট হইতে নিয়মিত সাহায্য পাইয়া থাকে। ছাত্রদিগকে তিনি নিজ সন্তানের ন্যায় দেখেন। কিন্তু তাঁহার দানের কথা দানগ্রহীতা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ পায় না। ভগবান যেন তাঁহার নীরোগ দীর্ঘ জীবন দান করেন—যেন তিনি অতুলনীয় প্রতিভাদ্বারা নিজের ও দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারেন।

(সংকলিত—শতদল)

বাংলার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও বাঙালীর সৃজনী প্রতিভা

বাংলাদেশে বিশেষভাবে বিজ্ঞান আলোচনার জন্য সর্বপ্রথম যে প্রতিষ্ঠান গঁড়িয়া উঠিল তাহা সায়েন্স এসোসিয়েশন। ডাঃ মহেন্দ্রলালের জীবনব্যাপী পরিশ্রম ও চেষ্টায় নানা বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রথম জীবনের সংগ্রামের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সায়েন্স এসোসিয়েশনের লক্ষ্য এইরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে—"The object of the Association will be to cultivate science in all its departments, both with a view to its advancement by original research, and to its varied applications to the arts and comforts of life."

বিজ্ঞানের এই সর্বাঙ্গীণ ও পরিপূর্ণ আদর্শ লইয়া বিজ্ঞান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার বহুবাজারে ইহার বৃহৎ অট্টালিকা ও বীক্ষণাগার অবস্থিত ছিল। ১৮৭০ সাল হইতে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৬৮ বৎসর যাবৎ ইহা বাঙালীকে বিজ্ঞান-চর্চায় অনুপ্রেরণা ও সুযোগ দিয়া আসিয়াছে। শুধু বাঙালী কেন, আজ সমস্ত ভারতের অধিবাসী এখানে বিজ্ঞান অনুশীলন করিয়া জগতে নূতন সত্য প্রচার করিতেছে। বাংলার ও বাঙালীর এই প্রতিষ্ঠানটিই তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ফুটাইয়া তুলিবার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে কি ?

ডাঃ রামনের কথা পূর্বেও বলিয়াছি। ইনি বিজ্ঞান-শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পাইয়া ভারতবাসীর গৌরব বর্ধন করিয়াছেন।

ডাঃ রামনের এই বৈজ্ঞানিক প্রতিভার মূলে সায়েন্স এসোসিয়েশন। কলিকাতায় তখন তিনি সরকারী দপ্তরে হিসাব-নিকাশের কাজ করিতেন, তাঁহাতে স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি সরকারী কাজের চাপে গুমরিয়া মরিতেছিল। এমন সময় একদিন ট্রামে চড়িতে যাইয়া দেয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপন দেখিলেন—Indian Association for the Cultivation of Science। রামনের মনে তখন নানা কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞান-চর্চার জন্য এমন একটা প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে, রামনের তাহা ধারণা ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ ঠিকানাটা টুকিয়া লইয়া সায়েন্স এসোসিয়েশনের খোঁজে ছুটিলেন। অফিসে আর সেদিন যথাসময়ে যাওয়া হইল না। সেদিনই তিনি সায়েন্স এসোসিয়েশনে ঢুকিয়া গেলেন।

এইখানে আসিয়াই স্বর্গীয় আশুতোষের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। আশুতোষের মানুষ চিনিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি রামনকে সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতে বলিলেন। রামন আশুতোষের উপর নির্ভর করিয়া চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন।

ইহার পর হইতে রামন দিবারাত্রি বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রমের ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। পৃথিবীর একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরূপে শীঘ্রই তিনি পরিগণিত হইলেন। ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটী তাঁহাকে এফ্. আর. এস্. করিয়া লইলেন। ইহার পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' পাইয়া তিনি জাতির মুখ উজ্জ্বল করিলেন। পৃথিবীতে তাঁহার প্রতিভার সম্মান প্রতিষ্ঠিত হইল।

বহু দিন স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামনই সায়েন্স এসোসিয়েশনের কর্ণধার ছিলেন। স্যর চন্দ্রশেখর যেমন সায়েন্স এসোসিয়েশনের সৃষ্টি, সায়েন্স এসোসিয়েশনের উন্নতিও তেমনি চন্দ্রশেখরের অনেকখানি দান।

ইহার পর বাংলার উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নব-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিজ্ঞান-মন্দির।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজ, বলিতে গেলে স্যর আশুতোষের অক্ষয় কীর্তি। তাঁহারই চেষ্টায় স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত ও ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের পঁচিশ লক্ষ টাকা দান পাইয়া বাংলার এই বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ ইহা বাংলার গৌরব। বাংলার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের দল এই বিদ্যায়তনে গবেষণা-কার্য দ্বারা পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন এবং বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জ্জি, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, ডাঃ প্রিয়দারঞ্জন রায় ও ডাঃ পুলিনচন্দ্র সরকার প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অধ্যাপক-পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। স্যর সি. ভি. রামন ও ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু এখানে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিয়াছেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহা এখানে যোগদান করিয়াছেন।

বর্তমানে বিজ্ঞান নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

কলিকাতা বিজ্ঞান-মন্দির একটা নূতন আদর্শ লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলা ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান-চর্চা ইহার লক্ষ্য। কলিকাতার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ ইহার পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন, ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ দে, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ বসু, ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ইহার পরিচালক-মণ্ডলী।

কলিকাতা বিজ্ঞান-মন্দিরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এইরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে—

বর্তমান জগতে বিজ্ঞানের অনুশীলন ভিন্ন কোন জাতির পক্ষে কর্মজীবনে উন্নতি লাভ করা সহজ নহে। বিজ্ঞানবিদ্যা জাতির মধ্যে বহুল প্রচার করিতে হইলে মাতৃভাষাতে উহার চর্চা ভিন্ন উপায় নাই। মাতৃভাষার সহায়তায় স্বাভাবিক সহজ ভাবে ও সুলভে যাহাতে দেশময় বিজ্ঞানের প্রসার হয়, তজ্জন্য বিশিষ্ট সভ্যগণের সমবায়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে।

"উক্ত পরিষদের উদ্যোগে দেশে সুষ্ঠুরূপে এবং বহুল ব্যাপক ভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচারের জন্য কলিকাতাতে ও বাংলার বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচারের জন্য কলিকাতাতে ও বাঙ্গালার প্রধান প্রধান নগরে ও মফঃস্বলে কার্যকরী বিজ্ঞান-শিক্ষানিকেতনসমূহ স্থাপিত হইবে। বর্তমানে কলিকাতা বিজ্ঞান-মন্দির এই সমুদয় বিজ্ঞান-শিক্ষালয়ের কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠানরূপ স্থাপিত হইল।"

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের অধ্যাপনা ও চর্চা যাহাতে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে, তজ্জন্য বিজ্ঞান-পরিষৎ 'পথ' নামক একখানি বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন এবং বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক পুস্তকসকল প্রকাশ করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত আচার্য জগদীশচন্দ্রের বসু-বিজ্ঞান-মন্দির বাঙালীর বিজ্ঞান-চর্চার এক অক্ষয় কীর্তি। উহার কথা পূর্বেই বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছি। আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু উহার ডিরেক্টর হইয়াছেন।

ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনষ্টিটিউট (Indian Statistical Institute) সমগ্র এশিয়াখণ্ডে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। ইহা খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশের অক্ষয় কীর্তি। ইহা কলিকাতার উপকণ্ঠ বরাহনগরে অবস্থিত।

যে সকল প্রতিষ্ঠান বৈজ্ঞানিক চর্চা দ্বারা ব্যবসায়ে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তন্মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বেঙ্গল-কেমিকেল ওয়ার্কস্ বাঙালীর প্রতিভা ও কার্যকরী ক্ষমতার বিশেষ

পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত বাংলা দেশে ইদানীং ছোট-বড় অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহারা বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করিয়াছে ও করিতেছে।

জগতের সঙ্গে সমতালে পা ফেলিয়া চলিতে হইলে, বাঙালীকে বিজ্ঞানের উপাসক হইতে হইবে। আজিকার দিনে ইহাই হইবে বাঙালীর জাতীয় সাধনা। বিজ্ঞান-সাধনা বাঙালীকে কর্ম-জগতে সুকৃতী ও সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলুক।